কার্পাস-শিল্প

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

কার্পাস-শিল্প

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
প্রণীত

১৩৩২

মূল্য—বারো আনা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
খাদি প্রতিষ্ঠান—
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎশশী রায়
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১এ, রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

বাংলার গৌরবের দিনের ইতিহাসের সহিত বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। একশত বৎসর আগেও এই শিল্পটা ভারতবর্ষকে সম্পদ-শ্রীতে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সে গৌরবের দিন আজ আর নাই। তথাপি সেই গৌরবের দিনকে স্মরণ করিবার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বলিয়াও মনে করি না। কারণ অতীত গৌরবের স্মৃতির পূজায় কেবলমাত্র নেত্রদ্বয়ই যে অশ্রু-সজল হইয়া উঠে তাহা নহে, মনও আশায় এবং আকাঙ্ক্ষায়, সাহসে এবং সঙ্কল্পে ভরিয়া যায়। দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় থাকিত তবে তাহার স্মৃতির খোঁচা হয় তো আমাদিগকে মানুষ হইবার পথও দেখাইয়া দিত।

ভারতবর্ষ একদিন প্রায় সমস্ত সভ্য-জগতের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়াছে। আর আজ সেই ভারতবর্ষকেই লজ্জা নিবারণের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। বস্ত্র-শিল্পের গৌরবের দিনের ইতিহাস যদি আমাদের জানা থাকিত তবে বিদেশী বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিতে দেহে না হোক্, আমাদের মনে যে ফোস্কা পড়িত তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই বিরাট বস্ত্র-শিল্প ধীরে ধীরে কিরূপ ভাবে যে নষ্ট হইয়াছে এ গ্রন্থে আমি বিশেষ ভাবে তাহারই ছবি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারের দুইটি মাত্র পথ আছে, এক

পথ কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা—দ্বিতীয় পথ চরখা গ্রহণের দ্বারা। মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা নহে—গৃহ-শিল্পরূপে চরখার প্রতিষ্ঠার দ্বারাই যে ভারতের গৌরবের দিন আবার ফিরিয়া আসিতে পারে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমার এই বিশ্বাসের মূলে যে সব যুক্তি আছে এই গ্রন্থের ভিতর তাহারও পরিচয় দিতে আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এ দেশের তুলার ফসল, লোকের মনস্তত্ত্ব, যে সব স্থানে মিল গৃহ-শিল্পের আসনে জাঁকিয়া বসিয়াছে সে সব স্থানের দুর্নীতি ও ব্যাভিচার, জাতির অপরিসীম দারিদ্র্য—এই সব দিক দিয়া যাঁহারা ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন তাঁহাদের যুক্তিও হয় তো আমার মতই মিলের বদলে চরখাকেই দেশের এই দুর্দ্দিনে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণ-যোগ্য পথ বলিয়া মনে করিবেন।

কার্পাস-শিল্প আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'কটন' নামক ইংরেজী গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে জীবিত ও মৃত বহু মনস্বীর লেখকের রচনা এবং অনেক সরকারী ও বে-সরকারী রিপোর্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাঁহাদের কাছে আমি ঋণী তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থের মধ্যে নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। তাঁহাদের সকলের কাছেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ভারতবর্ষের আকাশে উষার অরুণালোকের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন দেশের কথা ভাবিবার সময়, জড়তা দূর করিয়া কাজ করিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ। এই যুগ-সন্ধিতে যে পথ অবলম্বন করিলে দেশের মুক্তি সম্ভব বলিয়া আমি সত্যসত্যই বিশ্বাস করি, এ গ্রন্থে আমি তাহারই আলোচনা করিয়াছি। আমার এ গ্রন্থ পড়িয়া দুই একজনের মনেও যদি চরখার প্রতি আসক্তি জন্মে, আমি আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

তালিকা-সূচী

কার্পাস-শিল্প

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বস্ত্র-শিল্পের স্থান

অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি বস্তুই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনের জিনিষ। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা বস্ত্রকে অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র কৃষি লইয়াই পড়িয়া আছি। ফলে খাদ্য-শস্য আবশ্যকাতিরিক্ত মাত্রায় উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্তই যে দেশে থাকিতেছে তাহা নহে। উহার বেশীর ভাগই কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বন্দর হইতে বড় বড় জাহাজে চড়িয়া সাগরের ওপারে পাড়ি জমাইতেছে। বিনিময়ে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা না পাইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কারণ তাহার সমস্তই প্রায় বিলাসের পণ্য। যাহাদের ক্ষুধার সময় পেটে অন্ন পড়ে না, লজ্জা নিবারণের জন্য যাহাদের বস্ত্রের অভাব হয়, বিলাসের দ্রব্য তাহাদের কাছে কেবলমাত্র অনাবশ্যক নহে, তাহাদের কাছে তাহা নানা রকমের দুঃখের ভারি বোঝাও বহিয়া আনে। একথা যে সত্য আমাদের জাতীয় জীবনে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে ধরা পড়িতেছে। অপরিমিত শস্য উৎপন্ন করিয়াও আমাদের দেহ অন্নাভাবে শীর্ণ, অথচ বিলাসের আকর্ষণও আমরা এড়াইয়া চলিতে পারিতেছি না। এমন কি আমাদের মনীষীরাও সেই একই ভুল

করিতেছেন। বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণ—এই সমস্ত বিলাস সামগ্রীর মোহে তাঁহারাও মুগ্ধ এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সভ্যতার বাহিরের আবারণ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরের সত্যকার চেহারাটা আবিষ্কার করা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভবপর হইতেছে না।

এক সময়ে এদেশও ধনে এবং ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বৈদেশিক শাসনের অনুগ্রহে সে ধন-সম্পদ কর্পূরের মত উড়িয়া গিয়াছে। খাদ্যের ন্যায় বস্ত্রের সমস্যাও আজ এদেশের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। দেশের নর-নারীদিগকে অতি কষ্টেই আজ লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র খণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়। মহাত্মাজী সত্যই বলিয়াছেন, "ইংরেজ শাসন-কর্ত্তাদিগকে দস্যুর সহিত তুলনা করিলেও ভুল করা হয়। কারণ দস্যুরা বল-প্রয়োগে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা মনোহরণ করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে।

ভারতবর্ষেই কাপাসের জন্ম। তাহা সত্বেও বিদেশের বস্ত্রেই আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের চোখে মোহের কাজল পরাইয়া না দিলে এটা যে কত বড় কলঙ্কের কথা তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারিতাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইন্দ্রজালে আমরা অতিমাত্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়া আছি। আর সেই জন্যই চতুর স্বার্থপর বিদেশী বণিকদের পক্ষে আমাদিগকে বঞ্চনা করা আজ আর কিছুমাত্র কঠিন নহে। তাহারা আমাদের তুলাতে কাপড় তৈরী করিয়া আমাদের কাছেই বিক্রয় করিতেছে; আর আমরা এই অদ্ভুত ব্যবস্থাকেই বর্ত্তমান সভ্যতা এবং ব্রিটিশ শাসনের সুফল মনে করিয়া তাহাদিগকে বাহবা দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত বস্ত্র-শিল্পের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনিষ্ঠ যে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া আলোচনা না করিয়া তুলার চাষ বা ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই করিতে পারা যায় না। বস্ত্র শিল্পের দ্বারাই ভারতবর্ষ একদিন সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সম্পদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই নানা দেশের ও নানা জাতির লোক ভারতের উপকূলে আসিয়া হাজির হয়। তাহার পর হইতেই এদেশের যেখানে সেখানে বিদেশীদের লুণ্ঠন চলিতেছিল। বিদেশীদের আনাগোনার সেই প্রথম যুগে বাণিজ্যই অবশ্য ধনান্বেষীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা লোভে পরিণত হইতেও বেশী দেরী হইল না। বিদেশীরা ভারতীয় শিল্পের অনন্যসাধারণ পণ্য লইয়াই প্রথমে বাণিজ্য সুরু করে। এই পণ্য দ্রব্যের ভিতর কার্পাস-জাত মালই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেশে তুলা তখন প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হইত। সে পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, ভারতের বস্ত্রের অভাব দূর করিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত ব্যবসায়ীদের পক্ষে তখনকার দিনে তাহাই ছিল ঢের। এই উদ্বৃত্ত তুলা লইয়াই এদেশের সঙ্গে তাহাদের কারবারের হাতে খড়ি। তাহার পর এই বস্ত্র-শিল্পকেই তাহারা ধ্বংস করিয়াছে। ভারতের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেশের শিল্পের, বিশেষ ভাবে বস্ত্র-শিল্পের করুণ কাহিনী জড়াইয়া আছে। সে কাহিনী একদিকে যেমন অশ্রুজলে ধোওয়া অন্য দিকে আবার তেমনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় আসিয়া দেখিলেন, এদেশ কাঁচামাল ও শিল্প দ্রব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার বিশেষ, ইউরোপে এবং ইংলণ্ডে সে গুলির আমদানি করিতে পারিলে বেশ চড়া দামেই কাটিতে পারে।

লোভ যখন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, পথও তখন আর সহজ সরল থাকে না। বিদেশী বণিকেরাও লাভের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বাঁকা পথ অবলম্বন করিলেন। দিল্লীর রাজশক্তি তখন দুর্ব্বল। বাংলার নবাব বা সুবেদারদের শক্তির পরিমাণও খুব বেশী ছিল না। সুতরাং বণিকদের এই অনধিকার বল-প্রয়োগ হইতে দেশকে তাঁহারা সব সময় রক্ষাও করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে যখন ভারতীয় বণিকদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত তখন নবাব রুষ্ট হইয়া কখনো কখনো তাহাদের প্রতি শাস্তি বিধান করিতেন। কিন্তু এই বিদেশী বণিকগণ কেবলমাত্র অত্যাচারেই বিশারদ ছিলেন না, ষড়যন্ত্রেও তাঁহাদের মাথা অদ্ভুত উর্ব্বর ছিল। ফলে শাসন-কর্ত্তারা তাঁহাদের নিজের লোকের দ্বারাই প্রতারিত হইতেন। রাজ্যের কর্ম্মচারীদিগকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অত্যাচারের পথটাকে রীতিমত পরিষ্কার করিয়া রাখিত।

তাহার পর পলাশীর যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে যুদ্ধ না বলিয়া যুদ্ধের অভিনয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। নিজের সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলার মাথা হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িল। এই পরাজয়ের পরে বণিকদের ঔদ্ধত্যের মাত্রা যে একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছিল, ইতিহাসের পাতার উপর একটি বার চোখ বুলাইয়া লইলে সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বণিকেরা 'লগ্নী' কারবারে বহু পণ্য দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিয়া বিলাতে চালান দিতে লাগিল। ভারতের বাণিজ্য লক্ষ্মী সেই পণ্যের সঙ্গে যে ঘর ছাড়া হইয়া গেলেন ভারতবর্ষে আর তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

বাণিজ্যের জন্য বণিকেরা সে যুগে বাংলার ব্যবসায়ীদের উপর যে

অত্যাচার করিয়াছে হৃদয়হীনতার দিক দিয়া কোথাও আর তাহার জোড়া মেলে না। অত্যাচারের আগুনে জ্বলিলে কোন শিল্পই বাঁচিতে পারে না। বিদেশী বণিকদের অত্যাচারেই ভারতের তুলা এবং রেশমের বিখ্যাত শিল্পও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মীরকাশিমের তীক্ষ্ণ দূর দৃষ্টির কাছে সে যুগের বিদেশী বাণিজ্যের ভিতরের সেই চেহারাটা একবার ধরা পড়িয়াছিল—তিনি সেই শোষণ-দানবের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে তিনি সিংহাসন-চ্যুত হন। মীরকাশিমেব পরাজয়ের পর বিদেশী বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। ব্রিটিশ বণিকেরা বাংলার সুবেদারের মসনদে রাজ্য শাসনের ভার লইয়া জাঁকিয়া বসিলেন।

এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঢাকার মস্‌লিনের মত শিল্পও সেই অত্যাচারের চাপে টিকিতে পারিল না। মুজরী পোষাইতে না পারিয়া তাঁতিরা এত বড় একটা শিল্পকেও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। বন্যার তোড়ে যেমন ঘর-বাড়ী-দেশ ভাসিয়া যায়, বিদেশী বণিকদের অর্থের প্রতি অসাধারণ লোলুপতায় তেমনি করিয়া এদেশের শিল্প-বাণিজ্যও ভাসিয়া গেল; দরদীদের প্রাণপাত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে হয় পশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, না হয় ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় বস্ত্রের উপর ইংলণ্ডের নির্ভরতা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ভাগ্যদেবীর কৃপায় ঠিক যে সময় ইংরেজ বণিকেরা ভারতের বস্ত্র অত্যাচারে নষ্ট করিতেছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডে সুতাকাটা কলের আবিষ্কার আরম্ভ হয়। এই আবিষ্কারের মূলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের

প্রতিযোগিতা ছিল। ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র বিলাতে আমদানী হওয়ায় সেখানকার তাঁতিদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাঁতি সম্প্রদায়ের একব্যক্তিই (হারগ্রিভস্) সর্ব্বপ্রথম সুতাকাটা কল আবিষ্কার করেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লোপুপতার দ্বারা প্রপীড়িত ও মরণোন্মুখ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে লাগিল তখন ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের বস্ত্র রপ্তানীর জন্য রাজনৈতিক আবশ্যকতা হিসাবেই ইংরেজ রাজ কর্ত্তৃক ভারতের বস্ত্র-শিল্প সজ্ঞানে বিনষ্ট করিবার প্রচেষ্টাও চলিল। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প নষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়াই বৃটিশ-রাজ বিলাতে ভারতীয় বস্ত্রের প্রবেশ এক প্রকার নিষেধসূচক শুল্ক বসাইয়া বন্ধ করিয়া দেন ও বিনা শুল্কে বা নাম মাত্র শুল্কে ইংলণ্ডের কলে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতের বাজার প্রবেশ করান। কাঁচামাল ভারত হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য এবং বিলাতী বস্ত্রাদি ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রবেশের সুবিধার অন্যতম উদ্দেশ্য লইয়া রেলের প্রসার হইতে থাকে।

বিলাতী কাপড় ভারতবর্ষে প্রবেশ করায় ভারতীয় তাঁতি নিরন্ন হইতেছিল—তাঁত ছাড়িয়া তাহাদিগকে কৃষি কার্য্যই একমাত্র উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিতে হইতেছিল। এমনি করিয়া ভারতের দীন দুঃখী যে আরো দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছিল তাহা বৃটিশ পার্লামেণ্টের গ্রাহ্য করিবার দায় ছিল না। এ দেশেও আমাদের শিক্ষিত সজ্জনেরা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশী শিল্প ধ্বংসের অপকারিতা বুঝিতেছিলেন না। এই সময় (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরকারী কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিবার জন্য ইংরেজী শিক্ষাশালা স্থাপিত হইতে থাকে। এই

শিক্ষাশালায় আমাদের গুণী লোকেরা সেই শিক্ষাই পাইতেন যাহাতে তাঁহারা বুঝিতেন যে, দামে সস্তা হইলেই সে জিনিষ কেনা উচিত। দেশী হউক, বিদেশী হউক যাহা সস্তা তাহা কেনাই ঠিক। অবাধ-বাণিজ্য এবং মূল্যের মাপকাটি সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত লোক যতই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন এ দিকে তেমনি শিল্প ধ্বংসের জন্য তাঁতি জোলা কামার কুমার প্রভৃতির দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় শিল্পের ও শিল্পীর কি অবস্থা দেখিয়াছিলেন আর আজ আমরা দেড়শত বৎসর ইংরেজ শাসনের পর দেশের কি অবস্থা দেখিতেছি! ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য শিল্পীর প্রত্যেক খুঁটি-নাটী দ্রব্যটীর উপর পর্য্যন্ত টেক্স বসান হইয়াছিল। একটা উদাহরণ দিতেছি :—

১৮৪৮ সালে ভারতের অবস্থা বিচারের জন্য একটা 'সিলেক্ট কমিটি' বসে। উহাতে ফ্রান্সিস্ কারণ্যাক ব্রাউন নামে একজন ইংরেজ সাক্ষ্য দেন। এই সাক্ষ্য তিনি বলেন যে ভারতে "মুতার্ফা নামক টেক্স প্রত্যেক চরখা * প্রত্যেক বাড়ী এবং প্রত্যেক যন্ত্রের উপর বসান হইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি একটা চরখা বাহির করিয়া দেখান যে, কি প্রকার অকিঞ্চিৎকর এবং দরিদ্রের উপজীবিকার সহায়ক দ্রব্যের উপর টেক্স বসান হইয়াছিল। একথা উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্রাউন সাহেব জাতিতে ইংরেজ হইলেও ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতের কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন।

ভারতের বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের প্রথম কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ-লিপ্সা। প্রথমে তাঁহারাই এই ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত কর

---

* সূতাকাটার চরখা অথবা কাপাস ডলাই করার চরখাও (কেরকী) হইতে পারে শেষোক্ত দ্রব্য হওয়াই সম্ভব।

সুরু করেন। দেশী শাসক-সম্প্রদায় তখন যে কারণেই হোক্, বিদেশী বণিকের সেই রাক্ষসী ক্ষুধার গ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থা—শাসন-যন্ত্রের পরিচালকেরা এই শিল্পকে নষ্ট করিবার জন্যই তাঁহাদের বিচার ও বুদ্ধি সজাগ রাখিয়াছেন। সুতরাং একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প গোড়াকার কোনো গলদের জন্য, বা কুটির-শিল্প যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না বলিয়া ধ্বংস হইয়াছে। ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প যে ধ্বংস হইয়াছে তাহার কারণ, ভারতবর্ষের শাসক-সম্প্রদায় ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পের কল্যাণের জন্য এই শিল্পকে ধ্বংস করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এখনও যদি জন-সাধারণের মনে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান জাগিয়া উঠে, যদি অর্থ-নীতির দিক দিয়াও তাহারা নিজেদের ভালো মন্দ বেশ ভালো করিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে কলের কাপড় এবং বিদেশের সূতা দূর হইয়া একশ' বছরের আগের মত ভারতের ঘরে ঘরে চর্‌কায় সূতাকাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনার রেওয়াজ আবার ফিরিয়া আসিবে।

এক শত বৎসর আগেও কেবল কলিকাতার বন্দর হইতেই প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুই কোটি টাকার বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত। বর্ত্তমানের বাজারের হিসাবে এই দুই কোটির অর্থ অন্ততঃ দশ কোটি টাকা। কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতি বৎসর এখন প্রায় ৬০ কোটি টাকার তুলার বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়।

তাহা ছাড়া এদেশে বস্ত্র-শিল্পের সহিত রাজনীতির সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এই বস্ত্র-শিল্প নানা-দিক দিয়া এমন ভাবে আমাদিগকে জড়াইয়া আছে যে, তাহা বিশ্লেষণ

করিয়া দেখানো কঠিন—অন্ততঃ দুই চারি পাতায় তাহার হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেওয়া যায় না। বস্ত্র শিল্পের ধ্বংসের দ্বারা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ যদি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের জানা থাকিত তবে তাঁহারা খাদির এই আন্দোলনটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। এমন কি, তুলার চাষ যে গবমেণ্ট বিলাতের স্বার্থের দিকে তাকাইয়াই নিয়ন্ত্রিত করেন একথাটাও তাঁহাদের জানা নাই। কারণ তাহা জানা থাকিলে স্বরাজ লাভের জন্য খদ্দর আন্দোলনও যে অপরিহার্য্য একথাটাও তাঁহারা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেন।

এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার প্রতি ধাপের সঙ্গে বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস কাহিনীর এক একটি করুণ স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। কোম্পানীর হাত হইতে শাসন-যন্ত্র ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র যখন নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন তখনকার ইতিহাসে এবং তাহার পরে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসেও পাতার পর পাতা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প নানা রহস্যের ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। সে সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলা সম্ভবপর নহে। এমন কি তাহার ভিতর যেগুলি একটু অসাধারণ রকমের তাহার সকলগুলির বর্ণনা দেওয়াও এত ছোট প্রবন্ধে অসম্ভব। আমি কেবলমাত্র সেই অসাধারণ ঘটনাগুলির ভিতর যেগুলি আবার একটু বেশী রকমের বিচিত্র তাহারই দুই চারিটি নমুনা দিতে চেষ্টা করিব।

১৬৯০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেব

কোম্পানীর অত্যাচার এবং সম্রাটের উদারতা

(From Bolts' Considerations.)

"মালাবার উপকূলের নৌ-বহর অবাধে ভারতীয় বাণিজ্য-জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জ্জন করিলেও কোম্পানীর হুগলী ফ্যাক্টরীর প্রধান কার্য্যাধক্ষ মিঃ জব চ্যানকের অধীনের সৈন্যদল বাংলায় নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া চলিতেছিল। বোম্বাই-এর গবর্ণরের নির্ব্বুদ্ধিতায় যুদ্ধ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার ফলও কোম্পানীর পক্ষে খুবই সাংঘাতিক হইল। এই যুদ্ধের কবল হইতে মুক্তিলাভের পূর্ব্বে তাহাদের ৪ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ত ব্যয় হইয়া গেলই, তাহা ছাড়া তাহারা যে সমস্ত সুবিধা লাভ করিয়াছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। ভারতবাসীদের কাছে এবং মোগল দরবারে তাহারা যে বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাও আর তাহারা বজায় রাখিতে পারিল না। সুরাটের মোগল-সুবেদার সিদ্দি ইয়াকুব বোম্বাই অধিকার করিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিলেন। গলদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাস্তা দিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

"এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ইংরেজদের পক্ষে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছে সন্ধি এবং ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনোই উপায় থাকিল না। এই উদ্দেশ্যে 'ইংরেজ দূত'—এই আখ্যা দিয়া তাঁহারা দুই জন কর্ম্মচারীকে সুরাট হইতে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্যে নিযুক্ত প্রথম জনের নাম মিঃ জর্জ্জ ওয়েলডন, দ্বিতীয়টি একজন ইহুদী, তাহার নাম মিঃ এব্রাহাম নেভার। দূতদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন

ধরণের এক প্রথায় অভ্যর্থিত করিয়া তাহাদিগকে ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে হাজির করা হইল। তাহাদের হাত সৈন্যদের কোমরবন্ধের দ্বারা বাঁধা—সম্রাটকে তাহাদের অভিবাদন করিতে হইল সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িয়া। সম্রাট প্রথমে তাহাদিগকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন, এবং তাহার পর তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থনা জানাইতে অনুমতি দিলেন। তাহারা প্রথমে তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার পর তাহাদের যে ফরমান বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা পুনরায় মঞ্জুর করিবার জন্য এবং বোম্বাই হইতে সিদ্দিকে সসৈন্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবেদন পেশ করিল।

"ঔরঙ্গজেব ধীর-বুদ্ধি এবং শান্ত স্বভাবের নৃপতি ছিলেন। তিনি তাহাদের এই বশ্যতা মানিয়া লইয়া ইংরেজদিগকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু ক্ষমার সর্ত্ত থাকিল গবর্ণর চাইল্ডকে নয় মাসের ভিতর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং আর কখনও তিনি ভারতে ফিরিতে পারিবেন না। ফারমানও নূতন করিয়া মঞ্জুর করা হইল, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, যে সমস্ত ঋণ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্রাটের প্রজাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, লুণ্ঠন এবং অন্য প্রকারে তাহারা যে ক্ষতি করিয়াছে তাহারও খেসারত দিতে হইবে।

"মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহে এই ভাবে বিরোধের মীমাংসা হইয়া গেলে কোম্পানীর বাংলার অধ্যক্ষ মিঃ জব চ্যানক ইংরেজদিগকে ফ্যাক্টরীতে ফিরাইয়া আনিবার অনুমতি পাইলেন।"

ইহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের নানাস্থানে ব্যবসার জন্য ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সব ফ্যাক্টরীর ভিতর কলিকাতার ফ্যাক্টরীটিই নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে জব চ্যানকএর নাম উপরে

উল্লেখ করা হইয়াছে সেই জব চ্যানকই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কারখানার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিরূপে যে ইংরেজ বণিকেরা কলিকাতায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এখানে তাহার আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজেরা এই সময় পলাসীর যুদ্ধ জিতিয়া লইলেন।

১৭৬৭

বাংলার কার্পাস-শিল্পের ধ্বংস

(*Bolts' Considerations*—পৃ: ১৯১—৯৫)

সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর যখন ইংরেজেরাই প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজা হইয়া বসিয়াছেন অথচ নামে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, "কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসার পরিপ্লাবনের সেই সময়টাতে, যে সমস্ত গলদ প্রথমে গোপনে অনুভূত হইতেছিল তাহাই বঙ্গে সর্ব্বত্র একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে'। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সে সময় দেশের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ব্যবসার ক্ষেত্রে এখনকার মতই, কোম্পানীর একটি অবিচ্ছিন্ন অত্যাচারে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং ইউরোপের জন্য কোম্পানী তখন যে অদ্ভুত "লগ্নী" কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতেও এই অত্যাচারে ছাপের অভাব ছিল না। ইহার শোচনীয় ফল এদেশের প্রত্যেক তাঁতি, প্রত্যেক কারিগরকে একান্ত নির্ম্মম ভাবে ভোগ করিতে হইয়াছে। কোনো জিনিষ উৎপন্ন করা মাত্রই তাহা ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসার গণ্ডীর

ভিতর টানিয়া আনা হইত। ইংরেজ বণিক, তাহাদের বানিয়া, তাহাদের পশুচরিত্র গোমস্তা—ইহারাই গায়ের জোরে ঠিক করিয়া দিত, কোন কারিগরকে কতটা জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইবে এবং তাহার বিনিময়ে সে কত মজুরী পাইবে।

"মোগল-রাজত্বে এবং এমন কি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও তাঁতিরা বিনা অত্যাচারে নিজেদের ইচ্ছামত কাপড় বুনিত। এখন অবশ্য সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন নিজেদের মূলধন ব্যয় করিয়া কাপড় বুনিবার প্রথা সম্ভ্রান্ত বংশের তাঁতিদের ভিতরেও প্রচলিত ছিল। এই কাপড় তাহারা নিজেদের হিসাবেই কেনা-বেচা করিত। আলি-বুর্দ্দী খাঁর সময়েই একজন ভদ্রলোক—এখন তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতে-ছেন,—ঢাকায় এক প্রাতঃকালে ৮০০ খণ্ড মস্‌লিন* ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বস্ত্রগুলি তাঁতিরা স্বেচ্ছায় তাঁহার দুয়ারে বিক্রির জন্য আনিয়া হাজির করিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার পূর্ব্বে, যে ধরণের অত্যাচারের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে, সে ধরণের অত্যাচার সুরু হয় নাই। তাঁহার সময়েই ইংরেজ কোম্পানীগুলির শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদন প্রথার ধরণও বদলাইয়া যায় এবং গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া এই ধরণের অত্যাচারের গোড়া-পত্তন সুরু হয়। সিরাজদ্দৌল্লার সময়েই উপরোক্ত ভদ্রলোকটি, সেই সদ্যারব্ধ অত্যাচারের ফলে জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের কিঞ্চিদধিক সাত শত তন্তুবায় পরিবারকে ভিটা মাটি ও ব্যবসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য এদেশের লোক আর কোনো নবাবের সাহায্য পায় নাই। ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহ-পুষ্ট পশুচিত্ত কর্ম্মচারীদের

* এক খণ্ড মস্‌লিনের মূল্য তখনকার দিনে ১০০্ টাকা ধরা যাইতে পারে।

অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের কোনো উপায়ই আর তাহাদের খোলা ছিল না।

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যবসার একাধিপত্য লইয়া সমস্ত স্থানে সব শ্রেণীর কারিগরের উপর সব রকমের অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁতিরা তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে, দালাল এবং পাইকারেরা এই সব বিক্রয়ে সাহায্য করার অপরাধে কোম্পানীর লোকদের দ্বারা প্রতিনিয়ত ধৃত হইত। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরাইয়া দিয়া, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, তাহারা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করিত—তাহাদের সেই জাতি নষ্ট করিয়া চূড়ান্ত রকমের অপমানে এবং অত্যাচারে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না।—জোর করিয়া যে সব চুক্তি তাঁতিদের ঘাড়ে ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাই পালন করিতে না পারিলে কোম্পানীর লোকেরা তাহাদের জিনিষ-পত্র ক্রোক দিয়া সেই স্থানেই বিক্রি করিয়া ক্ষতি-পূরণ আদায় করিয়া লইত। বাংলায় এই চুক্তি 'মুচ্‌লেখা' নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। যাহারা গুটি-পোকা হইতে রেশমের স্থতা ছাড়াইত তাহারাও এই ধরণের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। রেশমের স্থতা পাকানোর দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ইহাদের অনেকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজেরা কাটিয়া ফেলিয়াছিল—এরূপ ঘটনারও প্রমাণ আছে। রেশমের কারি-গরদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও বাংলায় লর্ড ক্লাইবের রাজত্ব-কালেই সংঘটিত হয়। রেশমের কাঁচামালের উপর কোম্পানীর লাভের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সমাজের অতি পবিত্র নিয়মগুলিকেও এইরূপে পাশবিক অত্যাচারের দ্বারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে।...

"এইরূপে যে সব ব্যবসায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একাধিপত্য

বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার ভিতর দুইটি ব্যবসা এরূপ ছিল যে, গোড়ায় তাহা তেমন শোচনীয় বলিয়া মনে না হইলেও পরিণামে দেশের পক্ষে তাহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুইটি ব্যবসার একটি হইতেছে, লবণ, শুপারী, এবং তামাকের ব্যবসা—পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। অন্যটি হইতেছে **তুলার** ব্যবসা। সুরাট হইতে সমুদ্র পথে এই তুলার আমদানী করা হইত। ইহার গোড়ার উদ্দেশ্য ছিল দেশের কার্পাস-শিল্পকে ধ্বংস করা। কিন্তু যে ভাবে এই ব্যবসা পরিচালিত হইতেছিল তাহাতে আংশিক ভাবে রাজস্বেরও ধ্বংস সাধিত হয়।

"কলিকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য জোট বাঁধিয়া স্থির করিলেন যে, সম্ভব হইলে তাঁহারা বোম্বাই এবং সুরাট কার্পাসের সমস্ত মাল কিনিয়া লইবেন। যে ব্যবসাটা অবশেষে এই একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল গোড়ায় তাহাতে যে অর্থলাভ হয় তাহার পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা অথবা উর্দ্ধসংখ্যা ৩ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। এই টাকা তাঁহারা নিজেদের ভিতর অংশমত ভাগ করিয়া লইলেন। একাধিপত্য বিস্তারের গোড়াতে বাংলায় যে তুলার প্রায় ৮০ পাউণ্ড ওজনের এক মনের দাম ছিল ১৬ টাকা এবং ১৮ টাকা সেই তুলার এক মনের দাম আসিয়া দাঁড়াইল ২৮ টাকা এবং ৩০ টাকাতে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ইংরেজরা যাহাকে দেশী তুলা বলিত এবং বাংলার অধিবাসীর নিকট যাহা কাপাস নামে পরিচিত ছিল, তাহার ফলনের পরিমাণ হঠাৎ বাড়িয়া গেল। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই নূতন একটা ব্যবসার জন্য যমুনা এবং গঙ্গার পথে দূর দেশ হইতে বহু তুলা বাংলায় আমদানী হইল। ফলে ব্যবসাটাকে যাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা তুলার বিক্রয়ে তেমন

সুবিধা করিতে পারিলেন না। ব্যবসার কর্ণধারেরা অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া তুলার বিক্রির জন্য দুইটি ফিকির আবিষ্কার করিলেন। এই ফিকির দুইটির একটি হইতেছে, এমন একজন ডেপুটি নবাব নিযুক্ত করা, যিনি জমিদারদের ভিতর তুলা কাটাইতে পারিবেন। মহম্মদ রেজা খাঁ তখন কোম্পানীর নফরদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোক। তাঁহাকেই ডেপুটি নবাব করিয়া মুরসিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। দ্বিতীয় ফিকিরটি হইতেছে, এমন একটি পথ আবিষ্কার করা যাহাতে বাহির হইতে তুলা এদেশে প্রবেশ করিতে না পারে। এই ব্যবস্থা অনুসারে সত্য সত্যই কলিকাতা হইতে প্রচুর তুলা মহম্মদ রেজা খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রেজা খাঁও তাহা জমীদারদের ভিতরে চালান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বেহার প্রদেশের সীমান্তে শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে উত্তর প্রদেশ সমূহ হইতে আনীত সমস্ত তুলার উপরে একটি অসাধারণ করও ধার্য্য করা হইয়াছিল। বাংলায় বিদেশের তুলার আমদানী বন্ধ করার পক্ষে এ ব্যবস্থা যে খুবই কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।"

বস্ত্র ব্যবসার উপর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের একাধিপত্য বিস্তার

(*Blots' Considerations*—পৃঃ ১৯৬)

যে সব বস্ত্র বসোরা, জুডা, মক্কা, বোম্বাই, সুরাট মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে কাটিত স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সেগুলির উপরেও ব্যবসায়ের একচেটিয়া ব্যবস্থা বিস্তৃত হইল। সে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে তাহারই অনুরূপ। এই সব বস্ত্রের ভিতর কতকগুলি

ছিল, যে গুলি লইয়া ইংরাজ কোম্পানী ব্যবসা করিতেন না—যেমন ঢাকার মোটা ধরণের আনন্দি, হায়তি, সোণারগাঁ, সারবেত্তি প্রভৃতি মল্‌মল, কাশিমবাজার এবং রাধানগরের চাপ্পা, মুগা, টেম্পি, তারচান্দি এবং মুক্তা। তাহাছাড়া ছুকি সাড়ী, কুত্তানেজ, তসেটি প্রভৃতিও কোম্পানীর এই ব্যবসার তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কোম্পানীর কারবারী বস্ত্রগুলির মতই এ গুলির উপরেও একই কেন্দ্র হইতে একই রকমের অত্যাচার চলিত।"

সম্রাট ঔরঙ্গজেব কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবার অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রধানতঃ বস্ত্র-শিল্প এবং সাধারণ ভাবে ভারতের সমস্ত শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য কোম্পানীর নফরেরা দেশের ভিতর অত্যাচারের যে আগুন জ্বালাইয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ সম্রাটের সেই অনুগ্রহেরই পাল্টা জবাব। সম্রাট হয় ত কখন ধারণাও করিতে পারেন নাই যে তাঁহারই অনুগ্রহের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ধ্বংস হইবে,—বহু যুগের জন্য তিনি তাঁহার দেশের লুণ্ঠনের ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখিতেছেন।

কোম্পানী বাংলার সুবেদারী গ্রহণ করিবার আগে হইতেই তাঁহাদের অত্যাচার যে আরম্ভ হইয়াছিল বোল্টের Considerations নামক গ্রন্থের ভিতরে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই গ্রন্থেই দেখানো হইয়াছে যে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দেও কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বণিকের মুখোস বজায় রাখিয়াই তাঁতিদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। তখনও তাঁহারা যে বণিকের মুখোস ফেলিয়া দিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই তাহার কারণ, আভ্যন্তরীণ বিপদের আশঙ্কায় তখনও তাঁহাদের মন চঞ্চল হইয়াছিল।

বণিকের ছদ্মবেশে দেশের রাজা

(*Bolts' Consideration*—পৃঃ ৭৩)

"যাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে এশিয়াতে, বাংলার আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবসার উপর একাধিপত্য বিস্তার করাই ছিল তাঁহাদের প্রত্যেকটি চালের উদ্দেশ্য। এজন্য দরিদ্র কারিকর এবং ব্যবসায়ীদের উপর যে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন চলিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। ক্রীতদাসের মত কোম্পানী যেন তাহাদিগকে কিনিয়া লইয়াছিলেন। এই একাধিপত্য ফরাসী এবং ওলন্দাজ কোম্পানীগুলির ভিতরেও নানারূপ অভিযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওলন্দাজেরা এমনি একটা বিরোধের পর ইংরেজদের নিকট তাঁতিদিগকে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার একটি প্রস্তাবও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কলিকাতার কাউন্সিল এবং তাহার প্রেসিডেন্ট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের কথাগুলির ভিতর দিয়া বাংলায় কোম্পানীর ব্যবসার ভিতরের চেহারার পরিচয় যেরূপ ভাবে পাওয়া যায় এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহাদের ডিরেক্টরদের কাছে যে পত্র লিখিত হয় তাহার দ্বিষষ্ঠিতম অনুচ্ছেদ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতে লেখা আছেঃ—তাঁতিদিগকে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লওয়ার অর্থ মুখোস খুলিয়া ফেলা এবং আপনা-দিগকে দেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নবাবের হুকুম অনুসারেই কাজ করিতেছি বলিয়া আমরা ঘোষণা করিয়াছি, আমরা মুখোস পরিয়া আছি এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা সেই ছদ্মবেশের

অন্তরাল হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং তাঁতিদের সম্বন্ধে উক্ত পথ অবলম্বন করিলে আমাদের খোলস অত্যন্ত সোজাসুজি ভাবেই খসিয়া পড়িবে।”

তাঁতিরা যে এই বিদেশী কোম্পানীগুলির কোনো-না-কোনো একটির ক্রীতদাস বা তৈজস পত্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল ইহার পর সে সম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই এই বিদেশী কোম্পানীগুলির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। দেশের সমস্ত তাঁতিকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং দুই চারি জন তাঁতিকে তাঁহাদের কাজে ছাড়িয়া দেওয়ার আবেদন লইয়া অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারেই দ্বারস্থ হইতে হইত। ইহার ভিতরের অর্থ অবশ্য খুব গভীর। বণিকের উৎপীড়নে তাঁতিরা এমন কি গোটা ভারতবর্ষ যে কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পরিচয় ইহার ভিতর হইতেই পাওয়া যায়।

ইহার কয়েক বৎসর পরে মুখোস খুলিয়া ফেলার পথে যে সব বাধা ছিল সে সব বাধা দূর হইয়া যায়। সুতরাং তখন লর্ড ক্লাইবও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে নবাবের মসনদ অধিকার করিয়া বসেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দয়ার দানে ব্যবসা করিবার যে অধিকারের ভিত্তিটা পাকা হইয়াছিল এইরূপে রাজ্যের শাসন দণ্ডের অধিকারে তাহা বিরাট সৌধে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

নূতন নূতন অধিকারের দ্বারা কোম্পানীর রাজ্যের সীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে অত্যাচার বাংলার বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস করার জন্য প্রয়োগ করা হইতেছিল তাহাও বিনা বাধায় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তৃত হইতেছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া বাংলার দেওয়ানী অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্রাট সাহ্ আলম তখন সাক্ষী গোপালের মত দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অস্তিত্বই ক্লাইবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছিল। সুতরাং ক্লাইব চাহিবামাত্র তিনি ক্লাইবকে বাংলা, বেহার, উড়িষ্যা এই তিন স্থানেরই দেওয়ানী ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে একেবারে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন। উড়িষ্যা তখন মহারাষ্ট্রদের অধিকারে। তথাপি এই স্থানটির দেওয়ানীও ক্লাইবের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার ভিতরেও একটা বেশ বড় রকমের চাল ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহাদের পক্ষে এই ধরণের চালের অর্থ বিশেষ জটিল বলিয়া মনে হইবে না। কারণ কোনো রকমের একটা দাবীর অছিলায় পর-রাজ্য হস্তগত করার উদাহরণ পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে অতি সাধারণ ব্যাপার।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর অধিকার ছিল বাংলা, বিহার এবং উত্তর-সারকারের কিয়দংশের উপর। যদিও এই শেষোক্ত অঞ্চলের অধিকারে তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের সামরিক ও শাসন-নীতির ফলে ৪০ বৎসরের ভিতর আরো বহু স্থান কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, দিল্লী, আগ্রা, এবং দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থান অর্থাৎ দক্ষিণ-সারকার, কর্ণাটক, তাঞ্জোর, ত্রিচনোপল্লি, মালাবার এবং ধরিতে গেলে মহীশূর রাজ্যটাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসে।

১৮০৫

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই নবাধিকৃত স্থানগুলিতে যুদ্ধের আনুসঙ্গিক ঝড়-ঝাপটাই যে কেবল দেখা দিয়াছিল তাহা নহে, রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় শিল্প ধ্বংসের জন্য উৎপীড়নও সুরু হইয়া গিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতের শিল্প এবং জন-সমাজের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখার আদেশ প্রদান করেন। এই কাজের ভার পড়ে ডাঃ বুকানন হ্যামিণ্টনের উপর। তিনি সমস্ত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা এই রিপোর্ট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর ডাঃ হ্যামিলটন আবার দক্ষিণ ভারতের মত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উত্তর ভারতের লোক, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ভারও পাইয়াছিলেন। ডাঃ হ্যামিণ্টনের এই অনুসন্ধানের ফল মিঃ মণ্টগোমারী মার্টিন "Martin's Eastern India" নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানিও সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এই ছয় খণ্ড পুস্তকে ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, পল্লী-প্রথা, কৃষি ও বাণিজ্যের ধারা প্রভৃতির বিস্তৃত এবং নির্ভুল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অমূল্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংসের দ্বারা এ দেশের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহারা চেহারাও চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল মিঃ মণ্টগোমারী মার্টিন্ তাহাই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের সঙ্গে যে ভূমিকা যোগ

করিয়া দিয়াছেন দেশের তখনকার অবস্থাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি অংশ কেবলমাত্র ভাষান্তরিত করিয়া দিতেছি।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা

(Introduction to Martin's Eastern India—Vol. I.)

"দুইটি জিনিষ এমনি অদ্ভুত ভাবে সুস্পষ্ট যে তাহা চোখে না পড়িয়াই পারে না—প্রথমতঃ ভারতের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীদের অপরিসীম দারিদ্র্য।

"যাঁহারা পরের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবস্থা নিজেদের ভিতর অনুভব করিতে পারেন তাঁহারা যেন এই গ্রন্থ এবং ইহার পরবর্ত্তী দুই খণ্ড পড়িয়া ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন। আর যাঁহাদের মনে ইংলণ্ড ছাড়া আর কোনো দেশের লোকের দুর্দ্দশায় সহানুভূতির সঞ্চার হয় না আমি তাঁহাদিগকেও এই ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ ঘটনাগুলি মনে থাকিলে সকলেই আমার মত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, ইংলণ্ড তাঁহার ভারতীয় প্রজাদের উপর বাণিজ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছে এবং সে অন্যায়ের ভিতর অদূরদর্শিতারও অভাব ছিল না—বস্তুতঃ পাপের ভিতর অদূরদর্শিতার অভাব থাকে না।

"ইংলণ্ড তাহার কলের তৈরী দ্রব্যগুলি মাত্র শতকরা ২৷৷০ টাকা শুল্কে ভারতবর্ষের লোকদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে কিন্তু হিন্দুদের হাতে-কাটা সূতা বা রেশমের উপর শতকরা ২০ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বসাইতে দ্বিধা করে নাই। বিলাতে রপ্তানী করিতে

গেলেই ভারতের চিনির উপরে ট্যাক্স বসিয়াছে শতকরা ১৫০ টাকা, কাফির উপরে ২০০ টাকা, মরিচের উপর ৩০০ টাকা ইত্যাদি। যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ড দুই কোটি ষ্টার্লিং (দশ টাকার সমান) আদায় করিয়াছে, যে দেশ হইতে এক লণ্ডনেই প্রতি বৎসর রাজস্ব বাবদ ত্রিশলক্ষ পাউণ্ডের বেশী গিয়াছে, সেই দেশের উপর (আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের) উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছিল।

"প্রতি বৎসর ব্রিটিশ ভারত হইতে এই যে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড শোষণ করা হয়, ১২ টাকা হারেও (ভারতবর্ষের সুদের সাধারণ হার) যদি চক্রবৃদ্ধির নিরিখে তাহার সুদ কষা যায় তবে ৩০ বৎসরে এই টাকা ৭২,৩৯,৯৭,৯৭১ ষ্টার্লিংয়ের এক বিপুল অঙ্কে আসিয়া দাঁড়ায় অথবা ৫০ বৎসরের জন্য যদি ২০,০০,০০০ পাউণ্ডের উপরোক্ত হারের সুদ ধরা হয় তবে সংখ্যাটা আসিয়া দাঁড়ায় ৮৪০,০০.০০,০০০ পাউণ্ডে। নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের উপর এই যে শোষণ চলিতেছে ইংলণ্ডের মত অর্থশালী দেশের উপরেও যদি এই শোষণ চলিত তবে উহা ইংলণ্ডকেও দারিদ্র করিয়া ফেলিত। সুতরাং ভারতবর্ষে, যেখানে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী দুই পেন্স হইতে তিন পেন্স মাত্র, সে দেশের উপর ইহার ফল যে কিরূপ হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।"

এই গ্রন্থেরই তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় দেশের মাটির উর্ব্বরতা এবং অধিবাসীদের দারিদ্র্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"দেশের সৌন্দর্য্য এবং উর্ব্বরতা এবং দেশবাসীদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমি যে মত পরিপোষণ করি পূর্ব্বোক্ত বিবরণ তাহারই সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতেছে। এই গ্রন্থের ভিতরকার অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তও আমার মতের সত্যতাই সপ্রমাণ করে। এ সমস্তই জনসাধারণের চরমতম দুর্দ্দশার পরিচায়ক। ইহাদের দুর্দ্দশা এরূপ যে দুনিয়ার আর

কোনো দেশে তাহার তুলনা মেলে না। এই দুর্দ্দশা এমন ভাবে চলিতে দেওয়া যে বৃটিশ নামের পক্ষে সুগভীর কলঙ্কের বিষয় তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমাদের অর্থ-গৃধ্নুতা বা স্বার্থপরতার দ্বারা যে দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে গবর্মেণ্টের কাছে এই সরকারী রিপোর্টটি পেশ হওয়ার পরেও সে দুঃখ ঘুচাইবার কোনো ব্যবস্থা ইংলণ্ডে বা ভারতবর্ষে অবলম্বিত হইয়াছে কি? কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। বরং স্বার্থপর বৃটিশ বাণিজ্যের নির্দ্দয় নিপীড়নের দ্বারা এই সব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দারিদ্র্য আরও বাড়াইবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত হইতেছে। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া গেলেই পাঠকেরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের বহু লোক স্বাধীন ভাবে বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। অবাধ-বাণিজ্যের (Free trade) মিথ্যা আবরণে ইংলণ্ড হিন্দুদিগকে একদিকে যেমন নামমাত্র শুল্কে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানের কলের তৈরী কাপড় ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনি বাংলা বিহারের হাতে-তৈরী সুন্দর জমিনের টেকসই বস্ত্রগুলির উপর অসম্ভব চড়া শুল্ক বসাইয়া নিজেদের দেশে তাহাদের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রাচ্য দেশের যে-সব কারিগর ইংলণ্ডের ধনশালীদের পৃষ্ঠ-পোষিত কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করিতেছিল আমাদের বার্মিংহাম, ষ্টেফোর্ডশায়ার এবং গৃহ-জাত পণ্যের দ্বারা তাহাদের কারবারকে আমরা অসঙ্কোচে ধ্বংস করিয়াছি। তাহাছাড়া তাহাদের চিনি, কাফি, ইক্ষুরস, তামাক প্রভৃতিও আমরা গ্রহণ করি নাই। এই পরিহার নীতি যে ইংলণ্ডের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়। কিন্তু সে যাহাই হোক, এই সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে দিলেও হয়ত হতভাগ্য

হিন্দুরা পর্ব্বে পর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাতে লাঞ্ছনা এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা হইতে অন্ততঃ আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ভারতবর্ষে সাধারণের উপকারের কাজ আমরা কিছুই করি নাই। সমস্ত প্রচেষ্টাই ২,০০,০০০ সৈন্যের খরচ এবং অত্যন্ত ব্যয়-বহুল গবর্মেণ্টের ঠাট বজায় রাখার জন্য ও প্রতি বৎসর ২,০০,০০,০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করার প্রয়োজনের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৎসরের পর বৎসর আমরা দুই তিন এমন কি কোনো কোনো বার চার কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া আনিতেছি। এই টাকা ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্কীয় লোকসানের জের মিটাইতে, ভারতের শাসন ব্যাপার সম্পর্কে বিলাতের প্রতিষ্ঠানের রক্ষার জন্য যে ঋণ হয় তাহার সুদ যোগাইতে এবং যাহারা হিন্দুস্থানে জীবন কাটাইয়াছে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ইংলণ্ডের মাটিতে ব্যবসায় খাটাইতেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

"ভারতবর্ষের মত একটি সুদূর অঞ্চল হইতে কোনো প্রকার প্রতি-প্রেরণের ব্যবস্থা না করিয়া বৎসরের পর বৎসরে যে তিন কোটি হইতে চার কোটি পাউণ্ড আমরা শোষণ করিতেছি, ইহার একটি শোচনীয় পরিণাম আছেই। মানুষের এমন কোনো উদ্ভাবনী শক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না যাহার বলে এই শোচনীয় পরিণাম হইতে একেবারে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব।"

Martin's Eastern India, Vol. III, Page—XX, XXI.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিষ্ঠুর বাণিজ্যনীতিই যে ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে তাহা ১৮০০—১৮২৯ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কাপড়ের রপ্তানীর তালিকাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে। (স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্তের *Economic History, Vol I, page 295*)

ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী

বৎসর	বস্ত্রের বস্তা (Bales)	বৎসর	বস্ত্রের বস্তা (Bales)
১৮০০	২,৮৩৬	১৮১৫	৩,৮৪২
১৮০১	৬,৩৪১	১৮১৬	২,৭১১
১৮০২	১৪,৮১৭	১৮১৭	১,৯০৪
১৮০৩	১৩,৬৪৯	১৮১৮	৬৬৬
১৮০৪	৯,৬৩১	১৮১৯	৫৩৬
১৮০৫	২,৩২৫	১৮২০	৩,১৮৬
১৮০৬	৬৫১	১৮২১	২,১৩০
১৮০৭	১,৬৮৬	১৮২২	১,৬৬৮
১৮০৮	২৩৭	১৮২৩	১,৩৫৪
১৮০৯	১০৪	১৮২৪	১,৫৩৭
১৮১০	১,১৬৭	১৮২৫	১,৮৭৮
১৮১১	৯৫৫	১৮২৬	১,২৫৩
১৮১২	১,৪৭১	১৮২৭	৫৪১
১৮১৩	৫৫৭	১৮২৮	৭৩৬
১৮১৪	৯১৯	১৮২৯	৪৩৩

এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায় যে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই বস্ত্রের রপ্তানী ভারতবর্ষ হইতে একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময়টার ভিতরেই ইংলণ্ড তাহার বস্ত্রের ব্যবসা বেশ ভালো ভাবে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পরে ভারতবর্ষের কল-কারখানা হইতে কিছু কিছু বস্ত্রের রপ্তানীর ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু আইন করিয়া তৎক্ষণাৎ এই চেষ্টাকেও বাধা

দেওয়া হইয়াছে। সম-সাময়িক ঐতিহাসিক মিল এ জন্ম এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সত্য কথা অতি তীব্র ভাষায় তাঁহার কলম দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। তাহার এই কথাগুলি অনেকবার উদ্ধৃত হইয়াছে—আমি আবার তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভারতবর্ষ যে দেশের উপর নির্ভর করিয়া আছে সেই দেশ যখন তাহার প্রতি অন্যায় করে তখন তাহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ১৮১৩ সালে যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সূতী এবং রেশমের বস্ত্র তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বাজারে ঢের লাভে বিক্রি হইত। ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র হইতে তাহার দাম শতকরা অন্ততঃ ৫০—৬০ টাকা কম ছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের এই বস্ত্র-শিল্প বাঁচাইবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৭০—৮০ টাকার ট্যাক্স বসাইয়া এবং কোথাও বা স্পষ্ট নিষেধ দ্বারা ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। ব্যাপার যদি এইরূপ না দাঁড়াইত, এই ধরণের অসম্ভব চড়া শুল্ক যদি ভারতীয় বস্ত্রের উপর ধার্য্য করা না হইত তবে পেইস্‌লে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলি গোড়াতেই অচল হইত, বাষ্পের আবিষ্কার সত্ত্বেও তাহাদের পুনরায় গতি লাভের আর কোনোই সম্ভাবনা থাকিত না। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের দ্বারাই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত তবে সেও ইহার প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করিত না। সেও ব্রিটিশ-পণ্যের উপর খুব চড়া শুল্ক ধার্য্য করিয়া তাহার নিজের লাভজনক ব্যবসাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই। সে ছিল তখন বিদেশী বণিকের অনুগ্রহের ভিখারী। ব্রিটিশ পণ্য বিনা শুল্কেই তাই তাহার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছিল। বিদেশী

বণিকেরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্রে তাহাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে গলা টিপিয়া হত্যা না করিলে, সমতলের উপরে দাঁড়াইয়া যদি যুদ্ধ চলিত তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে কখনো সম্ভবপর হইত না।"

মণ্টগোমারী মার্টিন সমগ্র ভারত ঘুরিয়া বেড়াইয়া বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে আহূত হইয়া তিনি যে অত্যন্ত অসঙ্কোচে মত ব্যক্ত করিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনোই কারণ নাই। যে বস্ত্র-শিল্প হাজার হাজার লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে তাহার ধ্বংসের ইতিহাস তাঁহার নিজের চোখে দেখা বহু দৃষ্টান্ত হইতে তিনি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের খানিকটা অংশ আমরা এখানে ভাষান্তরিত করিয়া দিতেছি।—

বেহার এবং পাটনা সহরের বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে মার্টিনের বর্ণনা

(প্রথম খণ্ড—পৃঃ—৩৪৯)

"তুলাই এই অঞ্চলের বস্ত্র-শিল্পের সাধারণ উপাদান এবং যে পরিমাণ তুলা এই শিল্পে ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগই এই দেশে উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত নারী সূতা কাটে তাহারাই অধিকাংশ স্থলে তুলা হইতে বীজ ছাড়াইয়া লয় এবং অনেক সময় তাহারাই ধুনিয়াও লয়।

"যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যে সব নারী সূতা কাটার উপযুক্ত তাহাদের সংখ্যা জন-সংখ্যার $\frac{1}{4}$ অংশ তাহা হইলে আমার হিসাব অনুসারে সূতা-কাটুনীদের সংখ্যা হয় ৩,৩০,৩২৬ জন। কিন্তু এই সংখ্যার বেশীর

ভাগই দুপুরে কেবল মাত্র কয়েক ঘণ্টা করিয়া সুতা কাটে। সুতরাং মোটের উপর হিসাব করিলে বৎসরে গড়ে একজনের কাছে ৭/৮ পাই মূল্যের এবং সমষ্টিগত ভাবে বৎসরে ২৩, ৬৭, ২৭৭ টাকার সুতা পাওয়া যায়। এই ভাবে গড়-পড়্তায় হিসাব কষিলে খুচরা দামে তুলার দাম আসিয়া দাঁড়ায় ১২,৮৬,২৭২ টাকাতে। ফলে সুতা-কাটুনীদের সমষ্টি-গত লাভের পরিমাণ হয় ১০,৮১,০০৫ টাকা এবং ব্যক্তিগত লাভের পরিমাণ হয় ৩।০"

"সমস্ত সুতাই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছোট ছোট চর্‌কায় কাটা হয়। সুতা পরিষ্কার করা এবং তুলা ধোনার যন্ত্রও অতি সাধারণ ধরণের। সুতা কাটিলে এখানে কাহারো মর্য্যাদার হানি হয় না।

"তাঁতির সংখ্যা খুব বেশী। যাহারা পাটুয়া শ্রেণীর তাহাদিগকে সুতার তোয়ালে (খেস) বোনার কাজে নিযুক্ত করা হয়। এ দেশের লোকেরা এই 'খেস' নিজেদের বেশ-ভূষায় ব্যবহার করে। ইউরোপীয়দের কাছেও ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী, টেবিলের ঢাকনীরূপে তাহারা এই সব বস্ত্র ব্যবহার করে।

"বাকী তাঁতিদের অধিকাংশ দেশের ব্যবহারের জন্য মোটা বস্ত্র বোনে। বিদেশে চালান দিবার জন্য যাহারা সূক্ষ্ম-কাজ-করা বস্ত্র বয়ন করে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়।"

উপরের উদ্ধৃত অংশটি ১৮০৫ সালে লেখা। উহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে বয়ন শিল্প সে সময় এদেশে খুব বড় শিল্পরূপেই পরিগণিত ছিল এবং সুতা দেশের প্রায় সকলকেই কাটিতে হইত। স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, অর্থ-গৃধ্নু বিদেশী বণিকেরা এই শিল্পের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মূলোচ্ছেদের কাজ যে কিরূপ ভাবে চলিয়াছিল মার্টিনের এই গ্রন্থের একটি পাতা হইতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

"একজন ভদ্রলোক,—এদেশের লোকেরা তাহাকে বেলভার (সম্ভবতঃ 'বারবার') বলিয়া ডাকিত—জাহানাবাদ অঞ্চলের ২২০০ জন উৎকৃষ্ট তাঁতির সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। হোলাসগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জের সমস্ত, বিক্রাম, আরওয়াল ও দাউদনগরের কতক অংশ এবং রামগড়ের এক অংশের তন্তুবায়েরাও এই চুক্তির ভিতর ছিল। দুই টাকা (দাদন) দিয়া ইহাদের প্রত্যেকে কোম্পানীর "আসামী" হইত। কোম্পানীর প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর কাহারো কাজ করিবার তাহাদের অধিকার থাকিত না। এতদ্ব্যতীত দাদন হিসাবে কাহাকেও অগ্রিম আর একটি পয়সাও দেওয়া হইত না। কাহাকে কোন শ্রেণীর কত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। চুক্তিতে এ প্রকার সর্ত্তও থাকিত যে, নির্দ্দিষ্ট বস্ত্র সমস্ত চুকাইয়া মিটাইয়া দিলে তবে তালিকার লিখিত মত মূল্য মিলিবে।" (*Martin's Eastern India Behar and Patna City Vol. I, page 355*)

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার বস্ত্র-শিল্পের উপর যে অত্যাচার চলিয়াছিল এবং যাহার ফলে বাংলার বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইয়া যায় সেই অত্যাচার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হইতে থাকে মার্টিনের এই গ্রন্থখানির পাতাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া গেলে সে সম্বন্ধে আর এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বোল্টের Considerations ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয় এবং মার্টিনের Eastern India ১৮০৭ সালের লেখা। কিন্তু তাঁতিদের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনাকালে উভয় গ্রন্থের বর্ণনার ভাষার ভিতর খুবই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ এই পুস্তক দুইখানির বর্ণিত ঘটনার মধ্যে ৩৫ বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংসের কার্য্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শেষ

করিয়া ইংলণ্ড এতাবৎ সুখে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের লাভ ভোগ করিতেছে। এখানে আমি সংক্ষেপে সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার পরিচয় দিতেছি :—

১৮৩৩

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পর বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নূতন করিয়া আবার মঞ্জুর করা হয়। তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে কোম্পানী অতঃপর আর কোনো ব্যবসা করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ হইলেও ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা কিন্তু ঘুচিল না। ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী বাড়াইবার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র-শক্তি যে সব আইন তৈরী করিতেছিলেন তাহা ভারতবর্ষের সমস্ত রকম শিল্প-প্রচেষ্টার বিরোধী। সুতরাং ভারতবর্ষের ক্ষতির পরিমাণ দিনের পর দিন বাড়িয়াই উঠিতেছিল। এই ক্ষতির চেহারা দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসায়ীরূপে যে শোষণ-নীতি নিজেরা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, দেশের শাসন-কর্ত্তা রূপে তাঁহারাও তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত শুল্ক ভারতীয় শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা তুলিয়া দিবার জন্য পার্লামেণ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবেদন পেশ হইল।

ব্রিটিশ-রাষ্ট্র শক্তির এই সব আইন পাশ করিবার একটা গূঢ় অর্থও

ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বণিক ছিলেন তখন তাঁহাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্রব ছিল অল্প কয়েক জন লোকের। পরিচালকের সংখ্যা ছিল কম এবং ব্যবসার লাভালাভ ছিল কেবলমাত্র তাঁহাদেরই। সুতরাং ভারতবর্ষকে নির্জ্জীত করিয়া যে লাভ হইত তাহা অল্প কয়েক জনেরই অর্থ-স্পৃহাকেই পরিতুষ্ট করিত। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবসা সমস্ত বৃটিশ জাতির স্বার্থের জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ধনী হওয়ার ইচ্ছা তখন কোম্পানীর অংশীদারদিগকে ছাড়াইয়া সমস্ত বৃটিশ জাতির আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। ইহার ফল যাহা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তাঁহারা কোনো গুরুতর অন্যায় করিলে পার্লামেণ্টের নিকট হইতে হয় ত বা কতকটা প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল, কারণ পার্লামেণ্টের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু কোম্পানীর হাত হইতে বাণিজ্যের অধিকার তুলিয়া লওয়ার পর সে সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়া গেল। তাহা ছাড়া এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের শোষণে পার্লামেণ্টের সদস্যদেরও ব্যক্তিগত একটা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকের মনেও হয় ত ভারতবর্ষের ব্যবসাতে যোগদানের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে সুবিধা-জনক কোনো প্রস্তাব পাশ করিবার কথা উঠিলেই এই সদস্যেরা তাহার পথে অজস্র বাধার সৃষ্টি করিতেছিলেন।

১৮৪০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহারই ফলে একটি মামুলী ধরণের সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হয়। তখনকার বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা এই কমিটির কাছে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাঁহাদের জন কয়েকের সাক্ষ্য তুলিয়া দিলেই ধরা পড়িবে।

সিলেক্ট কমিটির কাছে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাঁহাদের জন কয়েকের সাক্ষ্য

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History—Vol. II. page 105.*)

মিঃ সি-ই-ট্রেভেলিয়ান কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন :—

"রেশমের মত এক বিশেষ ধরণের স্তা পূর্ব্বে বাংলায় কাটা হইত এবং সেই সূতাই ঢাকাই মসলিন তৈরীতে ব্যবহৃত হইত। এখন তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঢাকার জন-সংখ্যা দেড় লক্ষ হইতে প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ হাজারে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরের ভিতর জঙ্গল এবং ম্যালেরিয়া দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে এখন যে বস্ত্র তৈরী হয় তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোক ছাড়া গোটা ভারতের আর সকলেই ইংলণ্ডের তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করে। যে ঢাকা সহর ভারতবর্ষের ম্যাঞ্চেষ্টার ছিল তাহার সে উন্নতির আর চিহ্নও নাই। সহর ছোট হইয়া গিয়াছে, দারিদ্র্য তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ঢাকা এখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত।"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সিলেক্ট কমিটির কাছে মিঃ লারপেণ্টের সাক্ষ্য :— বিলাতে ভারতের বস্ত্রের রপ্তানী এবং ভারতে ব্রিটিশ-বস্ত্রের আমদানী সম্পর্কে মিঃ লারপেণ্ট কমিটির কাছে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি উপস্থিত করিয়াছিলেন :—

বৎসর	ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী	ভারতে ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানী
১৮১৪	১২,৬৬,৬০৮ খণ্ড	৮,১৮,২০৮ গজ
১৮২১	৫,৩৪,৪৯৫ ,,	১,৯১,৩৮,৭২৬ ,,
১৮২৮	৪,২২,৫০৪ ,,	৪,২৮,২২,০৭৭ ,,
১৮৩৫	৩,০৬,০৮৬ ,,	৫,১৭,৭৭,২৭৭ ,,

তাহার পর মিঃ লারপেণ্ট কমিটির কাছে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে মিঃ শোরের অভিমত উদ্ধৃত করেন :—"ব্রিটিশ-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই ভাবে ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করার কাজটাকে ব্রিটিশ নৈপুণ্যের জয়ের চমৎকার নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইহা ব্রিটিশ অত্যাচারেরই বড় উদাহরণ। নিজের দেশের স্বার্থের খাতিরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত আপত্তিজনক শুল্ক বসাইয়া ভারতবর্ষকে যে কিরূপ ভাবে দরিদ্র করিয়া ফেলা হইয়াছে ইহার ভিতর দিয়া তাহারই ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

মিঃ মণ্টগোমারী মার্টিন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক জোরালো ভাষায় কমিটির কাছে বলিয়াছিলেন :—

"সুরাট, ঢাকা, মুরশিদাবাদ এবং অন্যান্য যে সব স্থানে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা চলিত সে সব স্থানের ধ্বংসের কাহিনী এত করুণ যে, তাহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ নিয়মে এ ধ্বংস সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। এ ধ্বংস দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের পরিণাম।" সিলেক্ট কমিটি সম্পর্কে এই অধ্যায় শেষ করিতে গিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে বস্ত্র-শিল্প তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। লর্ড এলেনবোরো সুপারি

করিলেন, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে শুল্ক সম্পর্কে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহা দূর করা সঙ্গত। 'কিন্তু তখনও ভারতের বিলুপ্ত বাণিজ্য-পণ্যের শেষ পণ্য রেশমী বস্ত্রের সহিত ইংলণ্ডের রেশম শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এই পণ্যটির শুল্কের সামঞ্জস্য সম্পর্কে লর্ড এলেনবরো কোনো কথাই বলিলেন না।"

এইরূপে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ভিতরেই ভারতের বিপুল বস্ত্র-শিল্প অতীতের অন্তরালে মিশাইয়া গেল। কিন্তু এ ধ্বংসের বিস্তার কেবল মাত্র বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে নিবদ্ধ ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজেরা ভারতবর্ষের যে অংশটা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা ভৌগলিক ভারতের অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়হীন ভাবে তাঁহাদের ধ্বংসের কাজও যে চলিতেছিল এই সময় হইতেই তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

১৮৪৮

ভারতীয় তুলার সম্পর্কে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের সিলেক্ট কমিটি

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের সিলেক্ট কমিটির আলোচনা-সম্পর্কে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের ইতিহাসের আলোচনা আমরা করিয়াছি। বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইয়া গেল—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের ভিতর তুলার কারবারের সম্বন্ধও একেবারে চুকিয়া গেল না। বরং ল্যাঙ্কা-

শায়ারের মিলের জন্য ভারতবর্ষে যাহাতে তুলা উৎপন্ন হইতে পারে ইংরেজেরা তাহার দিকেই নজর দিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে একটি অনুসন্ধান কমিটিও বসিয়াছিল। সেই সময় হইতেই কমিটির পর কমিটি বসিতেছে এবং ভারতীয় কর-দাতাগণের অর্থ ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানাগুলির কল্যাণ-কল্পে ভারতবর্ষে কার্পাস চাষের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। এজন্য অর্থ ব্যয় করিতে গবর্মেণ্ট কিছুমাত্র কসুর করেন নাই। কিন্তু এত অর্থ-ব্যয় সত্ত্বেও তাঁহাদের পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানায় ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ তুলা ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৩

তুলার চাহিদার আকস্মিক বৃদ্ধি ও ভারতের কৃষিজীবীদের দুর্দ্দশা

"গ্রেট ব্রিটেন এমন একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন প্রয়োজনের জন্য যাহাকে অন্যের দ্বারস্থ হইতে না হয়। এই উদ্দেশ্যে বেরার এবং বোম্বাই প্রদেশে ল্যাঙ্কাশায়ারের উপযোগী তুলা উৎপাদনের চেষ্টা বহু দিন হইতেই চলিতেছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান জন ব্রাইট ইংলণ্ডের কাপড়ের কারখানাগুলিতে ভারত হইতে তুলা

আমদানীর বিশেষ ভরসা দিতে পারিলেন না। সুতরাং এই ধরণের সাম্রাজ্য গড়িবার কল্পনা গোড়াতেই স্বপ্নে পরিণত হইল। ইহার পর আমেরিকা ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কারখানাগুলির জন্য তুলা উৎপাদনের ভার লইলেন। ইংরেজেরা যখন এইরূপে এই অর্থনৈতিক সমস্যাটার প্রায় মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন তখনই আমেরিকার সহিত যুদ্ধ বাধিয়া সে দেশ হইতে হঠাৎ তুলার রপ্তানী বন্ধ হইয়া গেল। তখন আর ভারতবর্ষ ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। আমেরিকা হইতে তুলার রপ্তানী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সরবরাহের ভার লইতে হইল ভারতবর্ষকে। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তুলার রপ্তানী এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা হইতে ১৮০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রায় আসিয়া দাঁড়াইল। পর বৎসর রপ্তানীর পরিমাণ উঠিল ৩৫০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রায় এবং তাহার পরের বৎসর উঠিল ৩৭০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রাতে। তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, অতঃপর গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকার তুলা বর্জ্জন করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের জন্য ভারতবর্ষের তুলাই গ্রহণ করিবেন।”

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History—Vol. II, page 346*)

কিন্তু এ আশার কোনোই দাম ছিল না। ভারতবর্ষের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা ইংলণ্ড চিরদিনই অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানই চিরকাল তাহার কার্য্য-পদ্ধতির নিয়ামক ছিল। বর্ত্তমানের বিপদ কাটাইতে পারিলে ইংলণ্ড সাধারণ চক্ষু-লজ্জার ধারও যে ধারে না তাহার পরিচয় বহুক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে। মিঃ জর্জ্জ বিগউডের “কটন” নামক গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—“আমেরিকান যুদ্ধের সময় যখন ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলার

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তখন ভারতবর্ষের 'সুরাট' তুলা আমেরিকান তুলার স্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষের এই তুলা ছিল নিকৃষ্ট ধরণের। এই তুলায় সূতা কাটিতে বসিয়া শ্রমিকেরা অতিমাত্রায় উত্যক্ত হইয়া উঠিত। প্রার্থনা সভায় সাধারণ প্রার্থনা ছিল, 'হে ভগবান, আমাদিগকে আরও তুলা পাঠাও কিন্তু 'সুরাট'-তুলার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' তাহার পর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যখন প্রথম কিস্তির আমেরিকান তুলা আসিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারে পৌছিল, তখন আনন্দের আতিশয্যে এই অপ্রত্যাশিত করুণার জন্য শ্রমিকেরা ভগবানের কাছেই তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিল।"

আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহের দারুণ দুঃসময়টা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের তুলার রপ্তানীরও বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এই কয় বৎসরে কৃষকেরা তুলার চাষে বিশেষ ভাবেই জড়াইয়া পড়িয়াছিল। একান্ত আকস্মিক ভাবে তুলার দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠায় তাহারা মনে করিতেছিল, তুলার চাষের দ্বারা ভাগ্যার্জ্জনের দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ধান বা গমের চাষ না করিয়া তুলার চাষের দ্বারাই তাহারা তাহাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে আবার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং তুলার রপ্তানী হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশার আর সীমা-শেষ রহিল না। কৃষকদের এই সময়ের দুর্দ্দশার চেহারাটা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য তখনকার তুলার দাম এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কয়েকটি বৎসরের তুলার দামের একটি তালিকা আমি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই তালিকাটি শ্রীযুক্ত দাদা ভাই নৌরজীর—Poverty and Un-British Rule in India নামক গ্রন্থের ভিতরেও আছে। সংখ্যাগুলি প্রথমে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টারী রিটার্ণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রতি হন্দরের মোটামুটি দাম

বৎসর	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১৮৫৭	২	৮	৮
১৮৫৮	২	১০	৭
১৮৫৯	২	৫	১০
১৮৬০	১	১৭	০
১৮৬১	২	১৭	৫
১৮৬২	৬	৫	৯
১৮৬৩	৮	১৮	১১
১৮৬৪	৮	৯	৯
১৮৬৫	৬	৫	৭
১৮৬৬	৪	১২	০
১৮৬৭	৩	২	১০
১৮৬৮	৩	১২	৮
১৮৬৯	৪	৫	৮
১৮৭০	৩	৫	৬

দুর্দ্দিনে ইংলণ্ডকে তুলা জোগাইবার অপরাধেই আমেরিকান যুদ্ধের শেষে বোম্বাইকে একেবারে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইতে হয়। কৃষকেরা যে নিছক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই তুলার চাষে মনোনিবেশ করিয়াছিল তাহা নহে। তুলার দাম দুই পাউণ্ড হইতে একেবারে আট পাউণ্ড চড়িয়া বসায় তাহারা মনের ভিতর তুলার চাষের জন্য একটা তাগিদ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের

* এই বৎসর আমেরিকার তুলার ফলন খুব বেশী হইয়াছিল।

আমলা-তন্ত্র এদেশের তুলার চাষ বাড়াইবার জন্য সে সময় যে ঝোঁক দিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি উপায় একেবারে শেষ পর্য্যন্ত যাচাই করিয়া দেখিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন নাই। সুতরাং কেবলমাত্র লাভের লোভে নয় কতকটা বাধ্য হইয়াই এদেশের চাষীকেও তুলার চাষে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। অথচ এই চাপের কথাটা প্রয়োজন ফুরাইলে আমলা-তন্ত্রের মনেও ছিল না। তাই আমেরিকার যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের তুলার দাম আবার যখন তিন পাউণ্ডে নামিয়া দাঁড়াইল তখন চাষীদের দুরবস্থা একেবারে চরমে পৌঁছিলেও তাঁহাদের মনে তাহাতে কিছুমাত্র ঘা লাগে নাই।

ইংলণ্ডে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান তুলার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ বেল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই পরিমাণ কমিয়া ০·৭ লক্ষ বেলে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার পর ১৮৬২ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পরিমাণ ক্রমাগত কমিতে থাকে। ফলে এই কয়েক বৎসরেই ভারতবর্ষের তুলা অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হয়। বোম্বাইএর দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে সেখানে জমীর জরিপ সুরু হইয়াছিল। তুলার সাময়িক মূল্য বৃদ্ধির নিরিখে কৃষকের একান্ত ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্যের পরিমাপ করিয়া, সেটেলমেণ্টের কর্ত্তারা জমীর উপর ট্যাক্সের হার অতিরিক্ত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার পরিণাম দুঃখ-দুর্দ্দশা, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়া বোম্বাইকে একেবারে জেরবার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

আমেরিকান যুদ্ধ ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্পকে যে কত বড় একটা ঘা দিয়াছে ১৮৬১ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রেট-ব্রিটেনে যে পরিমাণ তুলার আমদানী হইয়াছে সেই পরিমাণটার দিকে নজর দিলে তাহা বেশ বোঝা যায়।

(মধ্য-প্রদেশ এবং বেরারের ১৮৬৭ সালের তুলার বিভাগের রিপোর্ট হইতে)

বেল অনুসারে

	১৮৬১	১৮৬২	১৮৬৩	১৮৬৪	১৮৬৫	১৮৬৬	১৮৬৭
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান তুলা	৯৮৬৬০০	১০৭২৪৩৯	১২২৩৭০০	১৩৯৯৫০০	১২৬৬৫২৫	১৮৪৭৭৬৩	১৫০৮৭৫০
আমেরিকান তুলা	১৮৪১৬০০	৭১১৬৬	১৩১৯০০	১৯৭৮০০	৪৬১৯২৭	১১৬২৭৪২	১২২৫৬৮৮
অন্যান্য রকমের তুলা	২০৭৫০০	৩০০৮৬৩	৫৭৬৬০০	৯৮৯৮০০	১০২৬৮৬৯	৭৩৮৫৫৩	৭৬৬৩৩৩
গ্রেট ব্রিটেনে মোট আমদানী	৩০৩৫৭০০	১৪৪৫০৬৮	১৯৩২২০০	২৫৮৭১০০	২৭৫৫৩২১	৩৭৪৯০৫৮	৩৫০০৭৭১
গ্রেট ব্রিটেন হইতে মোট রপ্তানী	৬৭৭২২০	৫৬৪৯০০	৬৬০৯৫০	৭৩২২৮০	৮৯০৮৩০	১৩৬৫৬৫	১০১৫০৪০
গ্রেট ব্রিটেনে ব্যয়	২৩৫৮৪৮০	৮৮০১৬৮	১২৭১২৫০	১৮৫৪৮২০	১৮৬৪৪৯১	২৬১২৪৯৩	২৪৮৫৭৩১

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ব্রিটিশ-ভারতের কার্পাস-শিল্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ৯.৮ লক্ষ বেল তুলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া হইতে গ্রহণ করে কিন্তু এই তুলার ভিতর হইতে মাত্র ৩.২ লক্ষ বেল নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া বাকী ৬.৭ লক্ষ বেল বাহিরে চালান করিয়া দেয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান যুদ্ধের জন্য আমেরিকার তুলার রপ্তানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলে উত্তরোত্তর ভারতের তুলার আমদানী বাড়িতে লাগিল। আমেরিকার যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার পরও ইংলণ্ডে তুলার রপ্তানী অবশ্য বন্ধ হইল না কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই অন্য দেশে পুনঃ রপ্তানী হইতে লাগিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ১৫ লক্ষ বেল ভারতীয় তুলা আমদানী করিয়া তাহার ভিতর হইতে ১০ লক্ষ বেলই আবার রপ্তানী করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা তুলার মূল্য

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History, Vol. II, Page 347.*)

বৎসর	দাম—পাউণ্ড হিসাবে
১৮৬১	৭৩,৪২,১৬৮
১৮৬২	১,০২,০৩,৪৭০
১৮৬৩	১,৮৭,৭৯,০৪০
১৮৬৪	৩,৫৮,৬৪,৭৯৫
১৮৬৫	৩,৭৫,৭৩,৬৩৭
১৮৬৬	৩,৫৫,৮৭,৩৮৯
১৮৬৭	১,৬৪,৫৮,২৭৭

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে আমেরিকান যুদ্ধের পূর্ব্বের বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে যে তুলা রপ্তানী হইয়াছে তাহার মূল্যের পরিমাণ ছিল কিঞ্চিদধিক ৭৩ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমেরিকান তুলার আমদানী বন্ধ হওয়ায় ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের চাহিদা মিটাইবার ভার যখন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইল তখন এই মূল্য কতদূর পর্য্যন্ত যে উঠিয়াছিল তাহার পরিচয়ও উপরোক্ত তালিকাতেই আছে। ইংলণ্ডের সেই দুর্দ্দিনে তুলার যোগান দিয়া ভারতবর্ষ বৎসরে সাড়ে তিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রারও বেশী লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার পর আবার যখন ইংরেজেরা দুর্দ্দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া আমেরিকার তুলাই তাহাদের মিলে ব্যবহার করিতে সুরু করিলেন তখন তুলার বাবদে ভারতবর্ষের পাওনার কড়ি সাড়ে তিন কোটি হইতে একেবারে দেড় কোটিতে নামিয়া দাঁড়ায়। যে সমস্ত কৃষক ইংরেজদের উপর নির্ভর করিয়া অন্য সমস্ত শস্যের চাষ বাদ দিয়া তুলার চাষে অবহিত হইয়াছিল ইহার পর তাহাদের দুর্দ্দশার কথা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের একশত বৎসরের গতানুদর্শন

১৭৬৭ হইতে ১৮৬৭ পর্য্যন্ত

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের উপর ব্রিটিশ বণিক এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জুলুম যে কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমি ১৭৬৭ হইতে ১৮৬৭—এই একশত বৎসরের ঘটনাগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। বস্ত্র-শিল্পের দ্বারা ভারতবর্ষের বহু লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইত। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাহার

পরে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের এই বিরাট শিল্পটি ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পকে ধ্বংস করার এই ধারা ইংরেজেরা বরাবর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কখনো তাঁহাদিগকে তাহাতে দ্বিধা করিতে দেখা যায় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ গোটা ভারতবর্ষ ছিল না—সে ছিল কেবল মাত্র ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর লর্ড ডালহাউসি বহু রাজ্য অধিকার করিয়া ব্রিটিশ ভারতের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের পর সমগ্র ভারত অধিকার করার পথে যে টুকু বা বাধা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। স্যার লেপেল গ্রিফিন এই সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যাপারটার উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যশালী ঘটনা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আর কখনো ঘটে নাই।" তাঁহার এ উক্তির অর্থ যে কি তাহা বোঝা কিছুমাত্র কঠিন নহে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের পদতলে ভারতবর্ষের তুলার ব্যবসার বলি-দানের কাজটা সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে অতি দ্রুত গতিতে সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে সে কাজটার ভিতর বর্ব্বরতা বা অত্যাচারের বীভৎস মূর্ত্তি আর দেখা যায় নাই—বর্ত্তমান সভ্যতার ছদ্মবেশে সে হত্যাকেও বেশ একটা শ্রী এবং মাদ-কতায় ভরিয়া তোলা হইয়াছিল।

লর্ড ডালহাউসির নাগপুর অধিকার—১৮৫৩

কোনো উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই নাগপুরের রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং রাজ্যটি সহজেই ইংরেজদের হাতের মুঠার ভিতর

আসিয়া পড়ে। তাহার পর হইতেই নাগপুরীদিগকে বিদেশী বস্ত্র পরাইয়া সভ্য করিয়া তোলার চেষ্টা রীতিমত ভাবেই সুরু হইয়া যায়। কিন্তু ১৮৫৩ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪ বৎসর ব্রিটিশ শাসনের আওতায় বাস করিয়াও তাহারা পুরাদস্তুর সভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কথাটা যে সত্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ বেরারের কার্পাস-কমিশনার মিঃ এইচ, আর কারন্যাকের লিখিত ১৮৬৭ সালের তুলার বিভাগের রিপোর্টের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"নাগপুর যেমন ভাবে স্থানীয় বস্ত্রের অনুরক্ত ভারতবর্ষের আর কোনো দেশই সম্ভবতঃ তেমন নহে এবং নাগপুরের মত ভারতবর্ষের আর কোনো স্থানেই সম্ভবতঃ ব্রিটিশ বস্ত্রের প্রসার এত অল্প হয় নাই। কেবল মাত্র তাহাই নহে, ইহার রপ্তানীর রিপোর্টের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, নিজেদের দেশে তো স্থানীয় বস্ত্র ইহারা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেই তাহা ছাড়া বেরার এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশেও এ দেশের বস্ত্রের ব্যবসা বেশ ভালো ভাবেই চলিতেছে। এ দেশের ভদ্র-সমাজে ম্যাঞ্চেষ্টার মিলের জগন্নাথী নামক বস্ত্রের চল খুব কম নহে। এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ কুর্ত্তা ব্যবহার করে। আর এই কুর্ত্তা বিশেষ ভাবে জগন্নাথী বস্ত্রের দ্বারাই ইহারা তৈরী করাইয়া লয়। কিন্তু তাহা হইলেও দেশের তৈরী সুন্দর ধুতি এবং নাগপুর ও উমরাইর-এর অন্যান্য বস্ত্রের ব্যবহার ম্যাঞ্চেষ্টারের মিল এখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বন্ধ করিতে পারে নাই। দেশের ভদ্র-সম্প্রদায় এবং বেরারের অধুনা-ধনী-কৃষক-সম্প্রদায় এই সব দেশী বস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র নাগপুর এবং চান্দাজেলার চরকায় কাটা মোটা নিকৃষ্ট সূতায় তৈরী কাপড়ের কোনো ক্ষতি করিতেও সমর্থ হয় নাই। এই অঞ্চলের সমস্ত কুলিই বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা এই দেশী বস্ত্রই বেশী

পছন্দ করে। ব্যাপারটা আরো একটু পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একখানি রিপোর্টের কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি। সে সময় আমি দেশী বস্ত্রের ব্যবসা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার একটি বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

চান্দা জেলার চিম্মুর পরগণার রাজস্ব নির্দ্ধারণের রিপোর্টের কিয়দংশ, ডিসেম্বর—১৮৬৪

"চিম্মুরের বাজারে যে সব পণ্য সপ্তাহে সপ্তাহে বিক্রয়ার্থে নীত হয় তাহাদের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য পণ্যই হইতেছে মোটা নিকৃষ্ট ধরণের বস্ত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুলার দর অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠা সত্ত্বেও এ বস্ত্রের আমদানী কিছুমাত্র কমে নাই। এ ব্যবসা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে 'ঢেড়'দের হাতেই আছে। তাহারা চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বোনে। এই কাপড় খুব টেকসই এবং মোটা হয়। বেরারের কুন্বীরা এই ধরণের কাপড় পড়িতেই ভালোবাসে। তাহারা খুব কর্ম্মী এবং হিসাবী লোক। সুতরাং সুদৃশ্য এবং কম-জোরী বিদেশী বস্ত্র তাহাদের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। তাহারা জামুরঘোট্টার দেশী বস্ত্রই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। তুলার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গেলেও ব্যবসার যে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, ঠিক তুলার দামের অনুপাতে কাপড়ের দাম না বাড়িলেও মূল্য অপেক্ষাকৃত ঢের বাড়ানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া উন্নতিশীল কুন্বীরা এ বস্ত্র এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ক্রয় করে। বেশী দামে বেশী পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করিবার

ক্ষমতাও তাহাদের বাড়িয়াছে। সাধারণতঃ প্রতি বুধবারে জামুর-ঘোট্টায় কাপড়ের বাজার বসে। বেরারের লোকেরাই বেশীর ভাগ কাপড় কেনে। গাড়ী বোঝাই করিয়া তুলা সরবরাহ করে হিঙ্গুল-ঘাট অঞ্চলের লোকেরা। 'ঢেড়'দের যে সমস্ত কারিগর এক সপ্তাহের মাল কাটাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহারাই এই তুলা হইতে পরবর্ত্তী সপ্তাহের সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। সপ্তাহের হাটে নানা ধরণের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সে সব দোকান পাটের আমদানী হয় তাহার সংখ্যা হইতে জামুরঘোট্টার বস্ত্র ব্যবসার ধরণ কতকটা বোঝা যায়। আমি হাটে দাঁড়াইয়াই ইহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের তালিকা	প্রত্যেক ধরণের বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকানের সংখ্যা
১। দেশী কারিগরদের তৈরী দামী ধুতি, শাল, পাগড়ী প্রভৃতির দোকান ...	২৫
২। বিলাতী বস্ত্রের দোকান	৫
৩। কোষ্টীদের দোকান—যাহারা সূক্ষ্ম দেশী বস্ত্র তৈরী করে	১১০
৪। রাঙ্গারী—বস্ত্র-রঞ্জনকারীদের দোকান—যাহারা দেশী রং-করা এবং ছাপ-দেওয়া বস্ত্র বিক্রয় করে	২৬
৫। সালেওয়ারদের দোকান—যাহারা রমণীদের জন্য রং করা কাপড় বিক্রয় করে ...	৫
৬। 'ঢেড়'দের দোকান—যাহারা নিজেদের তৈরী মোটা কাপড় বিক্রয় করে ...	৩৫০
	৫২১

এই তালিকা অনুসারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৫২১টি কাপড়ের দোকানের ভিতর মোটে ৫টি দোকান ছিল যাহাতে বিলাতী বস্ত্রের কেনা-বেচা চলিত। কিন্তু দেশকে সভ্য করিয়া তুলিবার কল যে কত জোরে চলিয়াছিল তাহার পরিচয়ও এই রিপোর্টের ভিতরেই আছে।

১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মধ্য-প্রদেশ হইতে যত দেশী বস্ত্রের রপ্তানী হইয়াছে এবং যত বিদেশী বস্ত্র উক্তস্থানে আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা—

বৎসর	দেশী বস্ত্রের রপ্তানী মণ হিসাবে	ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানী মণ হিসাবে
১৮৬৩—৬৪	৭৫,৩৬২	২২,৫৯১
১৮৬৪—৬৫	৫৪,২৭৭	৫৮,৪৯৬
১৮৬৫—৬৬	৫৫,০৫২	২৯,০৭০
১৮৬৬—৬৭	৫২,৮৯৩	৫৮,৪০২

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বেরারের খদ্দরের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭৫ হাজার মণ এবং বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ ছিল ২২ হাজার মণ। তিন বৎসর পরে দেশী বস্ত্রের রপ্তানী ৭৫ হাজার হইতে কমিয়া ৫২ হাজার এবং বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বাড়িয়া ২২ হইতে ৫৮ হাজার মণে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, বেরারে দেশী বস্ত্রের আমদানী হইতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীই বাড়িয়া গিয়াছে যদিও এই বিদেশী বস্ত্রের অধিকাংশই বেরারে ব্যবহৃত হইত না, বেরারের বাহিরেই চালান হইয়া যাইত। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ঢেড় রমণীদের সূতা কাটার যে কিরূপ অদ্ভুত শক্তি ছিল এই রিপোর্টের একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিব।

"রপ্তানীর সম্পর্কে উপসংহারে এখানে আমি কেবল একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিব। সে কথাটি হইতেছে এই—মধ্য-প্রদেশের কাপড় এবং সূতার যে শিল্প আমাদের কাপড়ের রপ্তানীকে এরূপ ভাবে বাধা প্রদান করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র পরিমাণেই খুব বেশী ছিল না, তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মূল্যবানও ছিল। নাগপুর, জব্বলপুর এবং আকোলার প্রদর্শনীতে দর্শকদিগকে এ কথা বিশ্বাস করানো কঠিন ছিল যে, সেখানে যে-সব সূতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সেকেলে আদর্শের চরকায় দেশী কারিগরেরা হাতে কাটিয়া তৈরী করিয়াছে। একখণ্ড দেশী সূতা আমি নিজে আকোলার প্রদর্শনীতে দেখাইয়াছিলাম। এই সূতাগাছি মাত্র এক পাউণ্ড ওজনের কিন্তু ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ১১৭ মাইল।"

আকোলা-প্রদর্শনীর সম্পর্কেই এই রিপোর্টে অন্যত্র বলা হইয়াছে—"এই প্রদেশের তৈরী নানা প্রকারের বস্ত্রের পাশে পাশেই বিলাতী আদর্শের বস্ত্র এবং বর্ত্তমানে যে সব বস্ত্র বোম্বাই মিল হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে তাহাও দেখানো হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি বহু লোক নাগপুর, চান্দা এবং ভুন্দারার বস্ত্রের সূক্ষ্মত্বে এবং সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন।"

বোম্বাই মিলের উল্লেখ হইতে বোঝা যায়, চরকার শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য দুইধার হইতে আক্রমণ সুরু হইয়াছিল। একদিকে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী অন্য দিকে দেশী মিলের চাপ—এই উভয় চাপের তলায় পড়িয়াই এ দেশের চরকার অত বড় শিল্পটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশের ভদ্র-সমাজের লোকেরা পশ্চিমের চাকচিক্য এবং এবং পশ্চিমেরই আমদানী কল-কারখানার মোহে তখন মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ঘরে তৈরী মজবুৎ কাপড় ফেলিয়া তাঁহাদের পছন্দ মিলের কাপড়কেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে ভারতবর্ষের

বস্ত্র-শিল্প যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন এমন কি যাহারা সূতা কাটে তাহারাও সেজন্য এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করে নাই। কেবলমাত্র তাঁতিরাই ইহার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া আঘাতটা বেশ জোরের সঙ্গে অনুভব করিয়াছিল। তথাপি তাহারা সহজে জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ করে নাই। কৃষি তখনই তাহারা অবলম্বন করিয়াছে যখন তাহাদের বাঁচিবার আর কোনো পথই খোলা ছিল না।

এই ধ্বংসের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়া কোনোই লাভ নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পর কয়েক বৎসরের ভিতরে চরকার শিল্প অতীতের অন্ধকারের ভিতর হারাইয়া গেল। কিন্তু কুটির-শিল্প ধ্বংস হইলেও ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপদ কাটিল না। ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা ইংরেজেরা বিশেষ আশঙ্কার চোখেই দেখিতে লাগিলেন। এ দেশে যদি কাপড়ের কলের সংখ্যা বেশী হয় তবে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলির টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে, এই মনে করিয়া ইংরেজ রাজনৈতিকদের মাথার টনক আবার নড়িয়া উঠিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জন্য ভারতের মিলের শিল্পও যে কিরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে পরের অধ্যায়ে আমরা তাহারই বর্ণনা করিব। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে গবর্মেণ্ট দুইটি নীতিই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন—সে নীতির প্রথমটি হইতেছে ল্যাঙ্কাশায়ারের জন্য ভালো তুলা উৎপন্ন করা—দ্বিতীয়টি হইতেছে ভারতের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে ল্যাঙ্কাশায়রের কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার তুলার ব্যবসা

তুলার চাষ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িলেও গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই তুলা ভালো জন্মায়। এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ সারা দুনিয়ার তুলার অভাব পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তুলার ব্যবসার ক্ষেত্রে আমেরিকা আসিয়া ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যেখানে মাত্র এক হাজার বেল তুলা রপ্তানী করিয়াছিল, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেইখানে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইল তিন হাজার বেলে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সে রপ্তানী করিল ১২ হাজার বেল, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ উঠিল ১০ লক্ষ বেলে, এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ ২০ লক্ষ বেল অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের দ্বিগুণ হইয়া গেল। তাহার পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এই পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইল ৩৫ লক্ষ বেলে। তাহার পরেই আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ বাধিল। ১৮৬০ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল আমেরিকায় তুলা বিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তুলার রপ্তানীও একরূপ বন্ধ ছিল। এই কয়েকটি বৎসর দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের পক্ষেও যেরূপ সঙ্গীন সময় ছিল তুলার পক্ষেও সেইরূপ সঙ্গীন সময় গিয়াছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ড তাহার বস্ত্র ব্যবসা সুরু করে। তুলা সরবরাহের জন্য সে বিশেষ ভাবে আমেরিকার উপরেই নির্ভর করিত।

ভারতবর্ষ হইতে যে তুলা সে গ্রহণ করিত তাহা অন্যত্র আবার রপ্তানী করাই ছিল তাহার রেওয়াজ। সুতরাং বস্ত্র-ব্যবসায়ে আমেরিকাই ছিল তাহার কর্ণধার। কিন্তু বাণিজ্য-নীতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এ নীতি একেবারেই সমীচীন বলিয়া মনে হইবে না। কারণ সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জীবন এবং সম্পদ যে ব্যবসার উপর নির্ভর করে তাহার কাঁচা মালের জন্য যদি প্রতিবেশীর উপর নির্ভর করিতে হয় তবে পরিণামে সে জন্য ঠকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় এ কথাটা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের বিস্তারের ভিতর দিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের কল-কারখানাগুলির ভবিষ্যৎ যখন বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল, ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নায়কেরা তুলার জন্য আমেরিকার পরাধীনতাও ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টায় তখন মনোনিবেশ করিলেন। ইহার পর হইতেই সাম্রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশগুলিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কল-কারখানার উপযোগী তুলা উৎপাদনের চেষ্টা চলিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের পক্ষে লম্বা আঁসওয়ালা আমেরিকান তুলাই ছিল বিশেষ ভাবে উপযোগী। ভারতীয় তুলার আঁস ছোট। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রয়োজন তাহার দ্বারা মিটিত না। ভারতবর্ষে ইংরেজদের বস্ত্রের বাজার দিনের পর দিনই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই বস্ত্র-শিল্পের বিস্তারের জন্য তাঁহারা কোন্ পথ যে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের পর ভারতবর্ষে যাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের উপযোগী তুলাও প্রস্তুত হইতে পারে ইংলণ্ডের সমস্ত চেষ্টা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল লইয়া সে মালের পণ্য আবার ভারতবর্ষকেই যদি বিক্রয় করা যায় তবে লাভের মাত্রাটা যে মাত্রা ছাড়াইয়াও উঠিতে

পারে, ব্যবসায়ী ইংরেজদের তাহা অজানা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ বণিকদের এ ফিকির কাজে খাটিল না, খোদার উপর খোদকিরি করিতে গিয়া তাঁহারাও পরাজিত হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের উপযোগী তুলা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষের মাটি আজ পর্যান্ত তাহাতে সায় দেয় নাই।

ধরিতে গেলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দেই আমেরিকার তুলা ইংলণ্ডের বাজারে ব্যবসার পণ্য হিসাবে প্রবেশ করিতে সুরু করে। এই সময় ভারত এবং আমেরিকা উভয়ের রপ্তানীই প্রায় সমান ছিল। ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২,৪৭,০০০ বেল এবং আমেরিকার ছিল ২,০৭,০০০ বেল। কিন্তু তাহার পর হইতে আমেরিকাই ইংলণ্ডের বাজারে বেশীর ভাগ তুলা সরবরাহ করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের উপর ভার পড়িয়াছে কেবলমাত্র ঘাটতি অংশটা পূর্ণ করিবার। পশ্চিমে যদি কোনো বার তুলার ফসল কম ফলে তবে পাদপূরণের ভারটা গ্রহণ করিতে হয় ভারতবর্ষকে। সুতরাং ভারতীয় তুলার রপ্তানীর কোনো একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। ১৮২২ সালে ভারতবর্ষের তুলার রপ্তানী কমিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছিল ২০,০০০ বেলে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া আবার ২,৭৮,০০০ বেলে গিয়া পৌছাইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪৯,০০০ বেল, আবার ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া ৫৬,০০০ বেল গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার তুলার ব্যবসার অবস্থাটা বুঝিতে হইলে সমস্ত দুনিয়ার রপ্তানীর ইতিহাসটাও জানা আবশ্যক। নিচে তালিকা দেওয়া গেল।

প্রথম তালিকা

পৃথিবীর তুলার হিসার-নিকাশ—বেল হিসাবে, প্রতি বেলের ওজন প্রায় ৫০০ পাউণ্ড
(প্রত্যেক সংখ্যার শেষের ০০০ পরিত্যক্ত হইয়াছে)

	আমেরিকা	ভারতবর্ষ	ইজিপ্ট	রাশিয়া	চীন	অন্যান্য দেশ	মোট
১৯১২-১৩	১৪১২৯	৪৪২১	১৫০৭	৯৪৭	২০০০	১১৫৪	২৪১৫৮
১৯১৩-১৪	১৪৮৮৫	৫০৬৫	১৫৩৭	১০৩২	২০০০	১২৭৭	২৫৭৯৬
১৯১৪-১৫	১৫০৬৭	৫২০৯	১২৯৮	১২৩৫	২০০০	১২১৩	২৬০২২
১৯১৫-১৬	১২৯৫৩	৩৭৩৮	৯৬১	১৪৮০	২০০০	১০৪৩	২২১৭৫
১৯১৬-১৭	১২৯৭৬	৪৫০২	১০২২	১০৫৮	২০০০	১১২০	২২৬৭৮
১৯১৭-১৮	১১৯১২	৪০০০	১২৬২	৫৭৮	২০০০	১২১৮	২০৯৭০
১৯১৮-১৯	১১৬০৩১	৩৯৭৮	৯৬৪	৩৮৩	২০০০	১৫৩৩	২০৪৬১-
১৯১৯-২০	২২১৮	৫৭৯৬	১১১৪	২০০	২০০০	১৬৯৫	২৩০২৩
১৯২০-২১	১৩৭৫০	৩৫৫৬	১১৫৬	২০০	১৫০০	১৬২৫	২১৭৮৭

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে যে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ বেল। এই তুলার ভিতর অর্দ্ধেকের বেশীই উৎপন্ন হইয়াছে আমেরিকায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকাতে তুলার চাষের জন্য জমী বেশী বাড়ানো হইতেছে বলিয়া তাহার ফলনও ক্রমাগতই অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার তুলা কোন্ দেশে কি পরিমাণে যায় পরে একটি ভিন্ন তালিকায় তাহা আমরা দেখাইয়া দিব। আমেরিকার পরেই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে তুলা জন্মে প্রায় ৫০ লক্ষ বেল। ভারতবর্ষের তুলার হিসাব-নিকাশটাও পরে খতাইয়া দেওয়া যাইবে। ভারতবর্ষের পর চীন। কিন্তু চীনের তুলা যে কি ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাহার তুলা নিজের দেশের বস্ত্র তৈরীতেই ব্যবহৃত হইতেছে। নতুবা রপ্তানী বেশী হইলে তাহা দুনিয়ার আমদানী-রপ্তানীর হিসাব-নিকাশের সময় ধরা পড়িতই। চীনের উৎপন্ন তুলা পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ বেল। এই তুলা যদি সে তাহার নিজের কাজে লাগায় তবে চীন বস্ত্র-শিল্পে যে কিরূপ স্বাবলম্বী তাহা সহজেই অনুমেয়। চীনের তুলার সম্পর্কে হিসাব-নিকাশে কেবল এইটুকু মাত্রই ধরা পড়িয়াছে যে তাহার ২০ লক্ষ বেল তুলাব ভিতর হইতে মাত্র আড়াই লক্ষ বেল বাহিরে রপ্তানী হয়, এবং ৫ লক্ষ বেল তাহার নিজের দেশের মিলেই বস্ত্র-বয়নের কাজে লাগে। সুতরাং এ অনুমান করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে যে, তাহার বাদ-বাকী অর্থাৎ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলার বেশীর ভাগের দ্বারাই চীনে চরকা চলিতেছে। কারণ রপ্তানী ও মিলে ব্যবহার ছাড়া তুলার ব্যবহারের সাধারণতঃ আর একটি মাত্র পথই আছে—চরকায় তাহার দ্বারা সূতা কাটা এবং তাঁতে তাহার দ্বারা কাপড় বোনা। ইজিপ্টে যে তুলা

জন্মে তাহার পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ বেল। ইজিপ্টের তুলা জিনিষ হিসাবে একেবারে প্রথম শ্রেণীর সুতরাং তাহা বিক্রয়ও হয় খুব চড়া দামে। রাশিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশে যে তুলা জন্মায় তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য। রপ্তানী হিসাবে তাহার দাম বিশেষ কিছুই নয়।

দ্বিতীয় তালিকা

আমেরিকার তুলার ইতিহাস

(বেল হিসাবে—১ বেলে ৫০০ পাউণ্ড)

প্রত্যেক সংখ্যার শেষের ০০০ পরিত্যক্ত হইয়াছে

বৎসর	ফলন	রপ্তানী	বৎসর	ফলন	রপ্তানী
১৭৯০	৩	০.৩	১৮৯০	৮৫৬২	৫৮৫০
১৮০০	৭৩	৪১	১৮৯৫	৭১৪৭	৪৭৬২
১৮১০	১৭৭	১২৪	১৯০০	১০১২৩	৬৮৯৭
১৮২০	৩৩৪	২৪৯	১৯০১	৯৫১০	৬৮৭০
১৮৩০	৭৩২	৫৫৪	১৯০২	১০৬৩১	৬৯১৪
১৮৪০	১৩৪৮	১০৬০	১৯০৩	৯৮৫১	৬২৩৪
১৮৫০	২১৩৬	১৮৫৪	১৯০৪	১৩৪৩৮	৯০৫৭
১৮৬০	৩৮৪১	৬১৫	১৯০৫	১০৫৭৫	৬৯৭৫
১৮৬১	৪৪৯১	১০	১৯০৬	১৩২৭৪	৮৮২৫
১৮৬২	১৫৯৭	২৩	১৯০৭	১১১০৭	৭৭৮০
১৮৬৩	৪৪৯	২৪	১৯০৮	১৩২৪২	৮৮৯০
১৮৬৪	২৯৯	১৮	১৯০৯	১০০০৫	৬৪৯২
১৮৬৫	২০৯৪	১৩০১	১৯১০	১১৬০৯	৮০২৬
১৮৭০	৪০২৫	২৯২৩	১৯১১	১৫৬৯৩	১১৬৮১
১৮৭৫	৪৩০৩	৩০৩৮	১৯১২	১৩৭০৩	৯১৯৯
১৮৮০	৬৩৫৭	৪৪৫৩	১৯১৩	১৪১৫	৯২৫৬
১৮৮৫	৬৩৬৯	৪২০১	১৯১৪	১৬১৩৫	৮৯৩১

* এই কয়েক বৎসর আমেরিকায় অন্তর্বিপ্লবের যুদ্ধ চলিয়াছিল।

আমেরিকার তুলা কত কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে উপরোক্ত তালিকাটির দিকে নজর দিলেই তাহা ধরা পড়ে। যুদ্ধের ঠিক পরে পরে আমেরিকার তুলার শতকরা ৭০ ভাগই রপ্তানীতে বিদেশে ব্যয় হইয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার তুলার ফলনের মোট পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ বেল। এই তুলার প্রায় ৩০ লক্ষ বেলই গিয়াছে বিদেশে এবং মাত্র ১৩ লক্ষ বেল তুলা তাহাদের নিজের দেশে বস্ত্র তৈয়ার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার তুলার ফলনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি বেল। এই তুলার শতকরা ৬৮ ভাগই সে বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বাদ-বাকী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিজ দেশে বস্ত্র-বয়নের কাজে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমেরিকা তুলার চাষ বাড়াইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহে নাই। সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের বস্ত্র-ব্যবসার পরিমাণও বাড়াইয়া চলিয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা তাহার মোট তুলার ভিতর হইতে রপ্তানী করিয়াছে শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ এবং তাহার নিজের মিল প্রভৃতিতে কাপড় বোনায় ব্যবহার করিয়াছে প্রায় ৭০ লক্ষ বেল।

এই সম্পর্কে মিঃ বিগ উড বলিয়াছেন—"দুই দিন আগেই হোক্, আর পরেই হোক্ যাহাতে আমেরিকার সমস্ত তুলাই তাহার নিজের মিলে বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় আমেরিকা বহুদিন হইতে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহা ছাড়া অন্য কোনো দেশে তুলার চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টাকেও সে বিশেষ ভালো নজরে দেখে না।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা আমেরিকায় গিয়াছিলেন। আমেরিকার কৃষি-সমিতির ডিরেক্টর তাঁহাদের কাছে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

"আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন

যুক্তরাজ্য তাহার তুলার ⅔ ভাগ রপ্তানী না করিয়া নিজের দেশেই তাহার অধিকাংশ বস্ত্র নির্মাণে ব্যয় করিবে এবং এই বস্ত্র-শিল্প যে কত বড় লাভের ব্যবসা তাহাও অনুভব করিতে সক্ষম হইবে।"

এই প্রসঙ্গে মিঃ বিগউডের মন্তব্যও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য :—

"এই আদর্শ আমেরিকা কার্য্যে পরিণত করিতে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে? ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে যুক্তরাজ্যে তুলার ফলনের মোট পরিমাণ ছিল ৮০,০০,০০০ বেল। পরের পাঁচ বৎসরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯০,০০,০০০ বেলে দাঁড়াইয়াছিল। ফলনের দিক দিয়া ১০,০০,০০০ বেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রটাও বাড়িয়া উঠে। পূর্ব্বে যেখানে ২০,০০,০০০ বেল তাহার নিজের দেশে বস্ত্র-শিল্পে প্রয়োজন হইত সেইখানে সে-বৎসর ২৫,০০,০০০ বেল সে নিজের দেশেই বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার বাড়তি উৎপন্নের অর্দ্ধেক সে লাগাইয়াছে নিজের দেশের বস্ত্র শিল্পে। ইহার ফলে দুনিয়ার কাঁচা মালের যোগানে ঢের কম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ ছিল মোটে ৯৫,০০,০০০ বেল। সে বৎসর ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক মিলকেই তুলা কম পড়ায় কাজের সময় কমাইয়া দিতে হইয়াছিল। সুতরাং মূলধন এবং মজুর উভয় দিক দিয়াই ল্যাঙ্কাশায়ারকে ক্ষতির ঝক্কি সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার পর বর্ত্তমানের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায়, আমেরিকায় কলকারখানাগুলিতে তুলার খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ৫৫,০০,০০০ বেল ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ৬০,০০,৫০০, বেল এবং ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে ৭২,৫০,-০০০ বেল তুলার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার উপনিবেশ এবং অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে তুলা উৎপন্ন করা অর্থনীতি এবং

বাণিজ্যনীতি এই উভয় দিক দিয়াই যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দুনিয়ার বস্ত্র-শিল্পের উপযোগী তুলার জন্য একটি দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকাও কোনো ক্রমেই সমীচীন নহে।

"যখন তুলার কাঁচা মালের যোগান পাওয়া না যায় তখন এদেশের কল-কারখানাগুলির অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহায় ও শোচনীয় হইয়া উঠে তাহার প্রমাণ আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময়েই পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার তুলা হঠাৎ ৩৮,২৬,০০০ বেল হইতে একেবারে ৩,০০,০০০ বেলে নামিয়া পড়ে। সে বৎসর ইংলণ্ডে আমেরিকা হইতে যে তুলা রপ্তানী হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল মাত্র ২১,৭৫০০০ বেল এবং তাহার পরের চারি বৎসর ইংলণ্ডে আমেরিকার তুলার রপ্তানী হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

আমেরিকার তুলার আমদানী এবং রপ্তানী প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে তাহার হিসাব-নিকাশের আরও বিশেষ বিশেষ অঙ্কগুলি জানা দরকার। তৃতীয় নম্বরের তালিকায় সেগুলি দেওয়া গেল।

তৃতীয় তালিকা

আমেরিকার তুলার ভাগ-বাটোয়ারা ও রপ্তানীর হিসাব নিকাশ, ১৮৩৬ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বেল হিসাবে—প্রতি বেলের ওজন ৫০০ পাউণ্ড (০০০ পরিত্যক্ত)

সময়	গ্রেটব্রিটেন	অন্যান্যদেশ	আমেরিকার ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ	মোটফসল	মোটরপ্তানী	গ্রেটব্রিটেনে মোট ফসলের রপ্তানীর শতকরা হিসাব	আমেরিকার ব্যবহৃত তুলার শতকরা হিসাব
১৮৩৬-৪১	৯৮৩	৪১৮	২৬৮	১৬৬৯	১৪০১	৫৮'৯৪	১৬'০৫
১৮৪১-৪৬	১২২৯	৫৪২	৩৯০	২১৬১	১৭৭১	৫৮'৯৪	১৮'০৬
১৮৪৬-৫১	১২৭৩	৫৩৮	৫৪৮	২৩২৯	১৭৮১	৫৩'৩৭	২৩'৫৬
১৮৫১-৫৬	১৬৯৬	৮০২	৭২০	৩২১৮	২৪৯৮	৫২'৭০	২২'৪০
১৮৫৬-৬১	২০১০	৯৯৩	৮২৬	৩৭৮০	২৯৫৩	৫৩'৫৬	২১'৮৮
১৮৬৬-৭০	১২৩৪	৪৪৫	৮৭৪	২৫৫৩	১৬৭৯	৪৮'৩৪	৩৪'২৬
১৮৭০-৭৫	১৮৯৭	৭৬৮	১১৮৩	৩৮৪৯	২৬৬৫	৪৯'৩০	৩০'৭৫
১৮৭৫-৮০	২১৫১	১২৩৯	১৫৫১	৪৯৪৭	৩৩৯০	৪৩'৫০	৩১'৩৪

১৮৮০ ৮৫	২৬০৪	১৫৫৪	১৯২৫	৬০৮৩	৪১৫৮	৪২'৮৩	৩১'৬৪
১৮৮৫-৯০	২৮৩৫	১৭৮৫	২২৫৮	৬৮৭৮	১৬২০	৪১'২৩	৩২'৮৩
১৮৯০-৯৫	৩১১১	২৭৭০	২৭৫৮	৮৩৪৬	৫৮৮৮	৩৭'২৮	৩৩'০৫
১৮৯৫-০০	২৯৪৩	৩৩১০	৩৪১০	৯৬৬৩	৬২৫৩	৩০'৪৫	৩৫'২৯
১৯০০-০৫	৩১২৯	৩৭৫০	৪৩১৯	১১১৯৮	৬৮৭৯	২৭'৯৪	৩৮'৫৭
১৯০৫-১০	৩১২৬	৩৭০২	৪৯৮৯	১২৩৯৭	৭৪০৭	২৫'২২	৪০'২৫
১৯১০-১১	৩৭০৫	৫০৮৩	৫৭৬৯	১৪৫৫৭	৮৭৮৮	২৫'৪৫	৩৯'৬৩
১৯১৩-১৪	৩৫৩২	৫৯৯০	৫০৯২	১৪৬১৪	৯৫২২	২৪'২	৩৫'০
১৯১৪-১৫	৩৯২০	৪৮৮৭	৭৯৩১	১৬৭৩৮	৮৮০৭	২৩'৪	৪৭'০
১৯১৫-১৬	২৭৬১	৩৪০৭	৫৮৪৫	১২০১৩	৬১৬৮	২৩'০	৪৮'৫
১৯১৬-১৭	২৮৯৫	৩২৮১	৬৪৮৮	১২৬৬৪	৬১৭৬	২২'৯	৫১'৫
১৯১৭-১৮	২৩৮৭	২২৫৪	৭৭০৪	১২৩৪৫	৪৬৪১	১৯'৩	৬২'৫
১৯১৮-১৯	২৪৯৪	৩০৩২	৭২৯১	১২৮১৭	৫৫২৬	১৯'৫	৫৭'০
১৯১৯-২০	৩৬৪৫	৩৬৪২	৪৮৩৪	১১৯২১	৭০৮৭	২৮'৮	৪০'৫
১৯২০-২১	১.৩৭	৩৯৮৮	৭৯৮৬	১৩৭১১	৫৭২৫	১২'৬	৫৮'০

সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ নাই যে, আমেরিকা বস্ত্র-শিল্পের প্রসার তাহার নিজের দেশে ক্রমাগতই বাড়াইয়া চলিয়াছে। যে হিসাবে তাহার তুলার উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার অপেক্ষা ঢের বাড়িয়াছে তাহাদের নিজেদের কল-কারখানায় তুলার ব্যবহারের পরিমাণ। উপরের তালিকায় দেখা যায়, ১৮৩৬—৪১ খৃষ্টাব্দে যেখানে আমেরিকার উৎপন্ন তুলার শতকরা ১৬ ভাগ তাহার কল-কারখানায় ব্যয় হইত, বাড়িতে বাড়িতে ১৮১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে ব্যয়ের অঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানে শতকরা ৬২·৫ ভাগে। গ্রেট ব্রিটনের সঙ্গে তাহার কারবারের অবস্থাটা কিন্তু ঠিক বিপরীত। ১৮৩৬—৪১ খৃষ্টাব্দে সে তাহার মোট তুলার শতকরা ৫৮·৯ ভাগ ইংলণ্ডে রপ্তানী করিত। কিন্তু তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর এই রপ্তানীর পরিমাণ কমিতে কমিতে ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে তাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৯·৩ ভাগে। উক্ত সালে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ বেলের সামান্য কিছু বেশী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নিজের দেশের তুলা নিজের দেশের শিল্পে ব্যবহার করিবার যে নীতি পরিগ্রহের সঙ্কল্প আমেরিকা করিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতেছে।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তুলার রপ্তানীর হিসাব-নিকাশের তুলনা-মূলক আলোচনায় আমেরিকার এই উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইংরেজরা আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া থাকা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। আমেরিকা ছাড়া আর যে দেশের উপর ইংরেজ নির্ভর করিতে পারে তাহা আমাদের এই ভারতবর্ষ। সেইজন্যই সরকারী কাগজ-পত্রের বহু স্থানে ল্যাঙ্কাশায়ারের

মিলের উপযোগী করিয়া ভারতবর্ষে তুলা জন্মাইবার উপায় আবিষ্কারের একটা চেষ্টা বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বাংলা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই এই তিন প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর তুলার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহের ভার প্রদান করেন, সেই সঙ্গে তুলার আঁসের উন্নতি-কল্পে গবর্মেণ্ট যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরীক্ষায় তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাই জানাইবার জন্য এক আদেশ জারী হয়। বড়লাটের ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখের সেই প্রস্তাব অনুসারে মিঃ জে, জি, মেডলিকট Cotton Hand Book for Bengal নামে তুলার সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তখন বাংলা প্রদেশ বলিতে সমস্ত উত্তর ভারতই বুঝাইত। মিঃ মেডলিকটের এই গ্রন্থে তখনকার সময়ের তুলার চাষের অবস্থা এবং চাষের উন্নতির জন্য গবর্মেণ্ট যেসব পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা—এ উভয় জিনিষই পাওয়া যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের উপযোগী লম্বা আঁসের তুলা জন্মাইবার জন্য গবর্মেণ্ট তখন যে কিরূপ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থের ভিতরেই আছে।

তুলার সম্পর্কে যত রকমের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল মেডলিকট তাঁহার গ্রন্থে সে সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া চ্যাপম্যান এবং রয়েলও এসম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রপ্তানীর জন্য ভারতবর্ষে ভালো তুলা উৎপন্নের যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমরা ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী ধরণের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া করিয়াছি এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ার অনুশোচনাও ভোগ করিতেছি।" সেই সময়ে ভারতবর্ষে আরো কতকগুলি ফার্মে ভালো বিদেশী তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বড়লাট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আক্রা নামক স্থানের কৃষি-সমিতির উপর তুলা সম্বন্ধে পরীক্ষার কাজ চালাইবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা এবং গোড়াকার খরচ বাবদ ৪৫,০০০ টাকাও মঞ্জুর করা হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষার কাজ চলে এবং তাহার পর পরিত্যক্ত হয়। ফল যে সন্তোষজনক হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত তুলা উৎপন্ন করার চেষ্টা চলে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল:—সি আইল্যাণ্ড, নিউ অর্লিন্স, আপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়া, বুরবন এবং ছেচেল্লেস্। হাতে কলমের পরীক্ষায় এইরূপ ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় যে পরীক্ষার কাজ বন্ধ হইয়াছিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পরেও তাহার জন্য ডাঃ রয়েলকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ আবার এই তুলার সম্পর্কেই গভর্ণর জেনারেলকে আর একখানা চিঠি লেখেন। কৃষি-সমিতির কাছেও উপদেশ চাওয়া হয়। কতগুলি চিঠি-পত্র লেখার পর স্থির হয় যে, আমেরিকা হইতে চারিজন তুলার চাষের বিশেষজ্ঞ আনা হইবে এবং কাপ্তেন টি বেলিস তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবেন। এই চারিজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ফার্মগুলিতে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কাপ্তেন বেলিস আড্ডা গাড়িলেন হামিরপুরে এবং মিঃ মারকার ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুরা বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া ভারতবর্ষের জমীতে আমেরিকান ধরণের চাষ এবং তুলা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৪১—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে এই সব পরীক্ষা চলিয়াছিল, সরকারী কাগজ-পত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই পরীক্ষার ফলও সেই একই ধরণের ব্যর্থতার ভিতরেই নিঃশেষ হইয়াছিল। আগ্রা জেলায় একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। আগ্রার কলেক্টর মিঃ জ্যাকসন এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের উপর যে তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া গেল :—"পৃথিবীর আর এক প্রান্তের লোক আসিয়া দেশের আবহাওয়া জমী এবং অন্যান্য বিশেষত্বের সহিত পরিচিত হইবার আগেই কোনো চাষ-আবাদকে যদি লাভজনক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া এবং ক্ষতি দিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। আমেরিকানরা এদেশে তাঁহাদের নিজেদের দেশের কৃষি-পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষকদের হাতে নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি দেওয়া হইল। অথচ এদেশের আবহাওয়া এবং জমি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনোই খেয়াল ছিল না।" (Medlicott's Cotton Hand Book, page—341).

এই পরীক্ষার ব্যাপারে অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়া গেল কিন্তু ভারতবর্ষের তুলার চাষের উন্নতি অনুমাত্রও হইল না। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে তুলার সাহায্যের যে আশা করিতেছিল সে আশাও অপূর্ণই রহিয়া গেল। ইহাতে একমাত্র লাভ হইয়াছিল এই যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ হয়ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কৃষকদিগকে তাঁহারা যেরূপ বর্ব্বর ও আনাড়ী মনে করিতেছিলেন বাস্তবিক পক্ষে তাহারা

সেরূপ বর্ব্বর বা আনাড়ী নহে। মিঃ মারকার ছিলেন এই বিশেষজ্ঞদের ভিতর একজন। তিনি ভারতীয় কৃষকদিগকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তাহাতে অন্ততঃ ব্রিটিশ জন-সাধারণ এবং কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর চোখের ঘোর কাটিয়া যাওয়া সঙ্গত। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এইসব কার্য্য যাহা কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহাতে গবর্মেণ্টের ব্যয় সম্পূর্ণ অনর্থক হইয়াছে। আমেরিকার পদ্ধতি ভারতবর্ষে অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবর্ষের কৃষকদের দেশের আবহাওয়া ও জমির শক্তি সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। আর তাহারই ফলে তাহারা ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা ঢের কম খরচে ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারে।" (Select Committee's Reports পৃঃ—২৩৫ ; স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History হইতে ; vol II—পৃঃ ১৩৬)

এই বৈদেশিক তুলা ভারতে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের ব্যর্থতাতেই নিঃশেষে চুকিয়া গেল না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে জানাইলেন, "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে বটে কিন্তু ঢাকার জমী এখনও যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। * * * * * সুতরাং দেশের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যাহাতে বিশেষ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তন্নিমিত্ত সপারিষদ বড়লাট ঢাকা জেলায় একজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন।" (Medlicott's Cotton Hand Book—page 345.)

ঢাকার এই পরীক্ষার ভার পড়ে মিঃ প্রাইসের উপর। আমেরিকার কৃষি-পদ্ধতি তাঁহার কাছেও বিশেষ পরিচিত ছিল। নিউ অর্লিনস্ এবং বরবন প্রভৃতি বীজ লইয়া তিনি ঢাকার নানা স্থানে পরীক্ষা

সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও তাঁহার অগ্রগামীদের মত ব্যর্থতার ভিতরেই নিঃশেষ হয়। ঢাকা ছাড়িয়া উত্তর বঙ্গ এবং অবশেষে আসাম পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু ফল সর্ব্বত্রই একই রকমের হইয়াছিল, কোথাও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে যাহাই হোক্, মিঃ প্রাইস ঢাকায় পরীক্ষা কালে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, "এই স্থানের অধিবাসীরা বংশী নদীর ধার পর্য্যন্ত তুলার আবাদ করে। তিনি এক জাতীয় তুলার সন্ধান পান তিন বৎসর পর যাহার আবাদ করিতে হয়। সে সময় এই তুলার গাছগুলি বীজ-কোষে পরিপূর্ণ ছিল। তুলার আঁসও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল তাহা সূক্ষ্ম এবং রেশমের ন্যায়। সাধারণ ধরণের আবাদী তুলা হইতে এগুলি বাজারে বারো আনা—একটাকা বেশী দামে বিকাইয়া থাকে।" মিঃ প্রাইস এই তুলার সমুদায় তথ্য কেন যে সংগ্রহ করেন নাই তাহা বোঝা যায় না। হয়তো তাঁহার উপর কেবলমাত্র বিদেশী তুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিবারই ভার ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া, যথেষ্ট মনোযোগ দিবার উপকরণ সত্বেও দেশী তুলা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন হইয়া ছিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর জন্য সস্তা এবং ভালো তুলা উৎপন্ন করার উৎসাহে গবর্মেন্ট নানা রকমের উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে এ দেশে বিদেশী তুলা উৎপাদনের পথে ভিন্ন ভিন্ন বাধা বড় হইয়া দেখা দিল। এই বাধা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের ভিতর মতের মিল বিশেষ ছিল না। কেহ বলিলেন, ভারতবর্ষে মাল পাঠানোর ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থর, এবং তাহাতে খরচা বড় বেশী পড়ে। এই পাঠানোর ব্যবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে তুলার বাজারে সস্তায় ভালো তুলা পাঠানো অসম্ভব। কেহ বলিলেন এ দেশে জল—

নিষেকের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশ্রী—জলের ভালো ব্যবস্থা করিতে পারিলে আপনা হইতে ভালো তুলায় বাজার ভরিয়া যাইবে। এই শেষোক্ত প্রস্তাবের ফলেই গঙ্গা হইতে খাল কাটিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য ফসলের উপকার হইলেও তুলার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইল না। কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই তুলার বদলে ইক্ষুদণ্ডের চাষ সুরু করিয়া দিল। খালের উৎসাহীরা একথা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ইক্ষুর চাষে যদি চাষীদের লাভের পরিমাণ বেশী হয়, তবে তাহারা কেন তুলার চাষে মনোনিবেশ করিবে! তাঁহারা চাষীদের দোষ দিতে লাগিলেন কিন্তু চাষীরা তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বেশ ভালো রকমেই বুঝিত। শস্য বাছাই করা সম্বন্ধেও তাহাদের অভিজ্ঞতা এই বিশেষজ্ঞের অপেক্ষা ঢের বেশী ছিল।

এই সব ব্যবস্থা ছাড়া গবর্মেণ্ট তুলার চাষের উন্নতির জন্য আরো কতকগুলি পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মাটির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আমেরিকার মাটির সহিত তুলনা-মূলক আলোচনাও এই সম্পর্কেই সুরু হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় নাই। কেবল আমেরিকার মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের মনের চাঞ্চল্য দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছে মাত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভালো তুলা জন্মানোর সমস্যা বর্ত্তমানে অতি মাত্রায় সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের ধীর-মন্থর গতিতে হতাশ হইয়া সাম্রাজ্যের অন্যত্র লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টাতেই এখন তাঁহারা বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে British Cotton Growing Association নামে একটি সমিতিরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমিতির

প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, ইংলণ্ডকে আমেরিকার তুলার কাঁচা-মালের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার দীনতা হইতে মুক্তি প্রদান করা। Cotton Grower's Association ভারতবর্ষে তুলার চাষের উন্নতির দিকে যেমন মনোনিবেশ করিয়াছেন তেমনি নূতন নূতন ক্ষেত্রের উপরেও তাঁহাদের নজর পড়িয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তাঁহারা বর্ত্তমানে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিযাছেন :— পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট, লাগোস্, দক্ষিণ এবং উত্তর নাইগেরিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকার ইউগাণ্ডা, ন্যাসাল্যাণ্ড, এবং রোডোসিয়া; সুদান এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্। মোটের উপর তুলাব চাযে অনেকটা উন্নতি হইলেও এখন পর্য্যন্তও ১০ লক্ষ বেলের বেশী তুলা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎপন্ন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং সমস্যা যথেষ্ট জটিল হইয়াই আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের নিক্তিতে সমগ্র দুনিয়ার তুলার পরিমাণটা যাচাই করিয়া দেখিলে এই সমস্যা যে কতটা জটিল তাহা বুঝা যায়।

চতুর্থ তালিকা

সমগ্র পৃথিবী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলার ফলন

(ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব অনুসারে)

১৯১৯ সালের ভারতীয় কটন কমিটির রিপোর্ট হইতে গৃহীত

	শ্রেণীর নাম	কোথায় উৎপন্ন	পৃথিবীর ফলন বেল হিসাবে— ৫০০ পাউণ্ডে এক বেল	পৃথিবীর তুলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ	পৃথিবীর অনুপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শতকরা অংশের নিরিখ
১	বেষ্ট সি আইল্যাণ্ড	সাউথ ক্যারোলিনা দ্বীপ সমূহে	৮,০০০		
		এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্এ ...	৪,০০০		
			১২,০০০	৪,০০০	৩৩
২	সি আইল্যাণ্ডস্	ফ্লোরিডা এবং জর্জিয়া ...	৭০,০০০		
		ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ ...	২,০০০		
	বেষ্ট ইজিপ্সিয়ান্	ইজিপ্ট	৫,৫০,০০০		

		সুদান			
	ষ্টেপল আমেরিকান	মিসিসিপি ডেল্টা ইত্যাদি	২,০০,০০০		
		ন্যাসাল্যাণ্ড, ইউগাণ্ডা, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা	৪০,০০০		
	পেরুভিয়ান	পেরু	১,২৫,০০০		
			১০,৮৫,০০০	৭,৬০,০০০	৭০
৪	আমেরিকান	আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স্	১,৫০,০০,০০০		
		মেক্সিকো ...	১,৫০,০০০		
		ব্রেজিল	৩,০০,০০০		
		রাশিয়া	৫,০০,০০০		
		পশ্চিম আফ্রিকা ...	১৫,০০০		
		লেভাণ্ট	১,০০,০০০		
		ভারতবর্ষ... ...	৪,০০,০০০		
		চীন এবং কোরিয়া ...	২,৫০,০০০		
			১,৬৭,১৫,০০০	৪,১৫,০০০	২·৫
৫	ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি	ভারতবর্ষ ...	৪৫,০০,০০০		
		রাশিয়া	৭,৫০,০০০		
		চীন	১৮,০০,০০০		
			৭০,৫০,০০০	৪৫,০০,০০০	৬৪
		মোট ...	২৫,৪,৮৪,০০০	৬২,৩১,০০০	২৪·৫

৪নং তালিকায় দেখা যায় দুনিয়ায় মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলার ৬২ লক্ষ বেল অর্থাৎ সমস্ত তুলার শতকরা ২৪.৫ ভাগ মাত্র জন্মায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর। এই ৬২ লক্ষ বেলের ভিতর হইতেও ভারতীয় ৪৫ লক্ষ বেল বাদ দিতে হইবে। কারণ ভারতীয় তুলার মাত্র ২ লক্ষ বেলই ইংলণ্ডে যায় এবং এই সামান্য তুলার সমস্তও ইংলণ্ডে থাকে না, কতকাংশ সেখান হইতে আবার রপ্তানী হইয়া অন্যত্র চলিয়া আসে। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ ১৭ লক্ষ বেল মাত্র।

সুতরাং ভারতবর্ষের তুলা ইংলণ্ডের মিলের পক্ষে অনুপযুক্ত হওয়ায় ইংলণ্ডকে নানা রকমের বিভ্রাটের ভিতর পড়িতে হইয়াছে। আর সেই কারণেই আমেরিকা হইতে তাহাকে বৎসরে ৩০ লক্ষ বেল তুলা খরিদ করিতে হয়। ইংলণ্ডের মিলে যে তুলা ব্যবহৃত হয় তাহার আঁশ লম্বা হওয়া দরকার। এই শ্রেণীর তুলা গবর্মেণ্ট হাজার চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষে উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে বৎসরে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ বেল পর্য্যন্ত তুলা উৎপন্ন হইলেও তাহা ইংলণ্ডের কাছে উৎপন্ন না হওয়ারই সামিল হইয়া আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের Indian Cotton Commiteeর রিপোর্টের ৫ম পৃষ্ঠায় আছে, "সকলেই জানে যে তুলার ব্যবসা বাস্তবিক পক্ষে ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ করে এবং এক সময়ে দুনিয়ার বস্ত্র-শিল্পের কল-কাঠি সমস্তই ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের হাতে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বস্ত্র-শিল্পের

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডকেও তাহার পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগকে সনাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া বেশী মাত্রায় মনোযোগ দিতে হইয়াছে, সূক্ষ্মতর বস্ত্র নির্ম্মাণের দিকে। এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য লম্বা আঁশের ভালো তুলার দরকার।"

সমস্ত দুনিয়াতেই বস্ত্র-শিল্পের প্রসার লাভের চেহারাটা বাস্তবিক সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্য সমস্ত দেশে কলের টেকো যে পরিমাণে বাড়িতেছে ইংলণ্ড তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ধীরে ধীরে সে পিছনে সরিয়া পড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে কোথায় কতগুলি টেকো চলিতেছে তাহার হিসাব-নিকাশ লইলে এদিক দিয়া ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা আরো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

পঞ্চম তালিকা

সমগ্র পৃথিবীতে সূতা কাটার উপযোগী টেকোর সংখ্যা

(প্রত্যেক সংখ্যার শেষ হইতে '০০০' পরিত্যক্ত হইয়াছে)

দেশ	১৯০০	১৯১৪	১৯২২
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	১৯৪৭২	৩২১০৭	৩৬৯৪৭
গ্রেট ব্রিটেন	৪৫৫০০	৫৬৩০০	৫৬৬০৫
জার্ম্মাণী	৮০০০	১১৫৫০	৯৫০০
রাশিয়া	৭৫০০	৯১৬০	৮৪৩০
ফ্রান্স	৫৫০০	৭৪১০	৯৬০০
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	৩৩০০	৪৯৭০	১৫৯৩

দেশ	১৯০০	১৯১৪	১৯২২
ইতালী	১৯৪০	৪৬২০	৪৫৮০
স্পেন	২৬১৫	২২১০	২৩০৭
সুইটজারল্যাণ্ড	১৫৫০	১৩৮০	১৫১৯
সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক	৪৩৫	৭১৫	৮১৫
পর্ত্তুগাল	২৩০	৪৮০	৪৮৭
ভারতবর্ষ	৪৯৪৫	৬৫০০	৬৮৭১
জাপান	১২৭৪	২৭৫০	৪৭১০
চীন	৫৫০	১০০০	২৬৬৬
ব্রেজিল	৪৫০	১২৫০	১৬২০
কানাডা	৫৫০	৯৬৫	১৩৭৫
হল্যাণ্ড	৩০০	৫০০	৭২০
বেলজিয়াম	৯২০	১৫৩০	১৬৩০
অন্যান্য দেশ	৬৫০	১০০০	১১৫৪
যেকোশ্লোভাকিয়া	——	——	৩৫৪৯

ইংলণ্ড তুলার কল-কারখানার জন্মস্থান হইলেও নিকৃষ্ট তুলা কাজে খাটাইবার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার ফলে বাণিজ্য-নীতির দিক দিয়া সে যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিয়াছে আজ আর তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। এই ভুলের ফল ইংলণ্ডের পক্ষে যে কোনো মুহূর্ত্তে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে।

জাপানেই ভারতীয় তুলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে রপ্তানী হয়। এই তুলার সুতায় মোটা বস্ত্র বুনিয়া জাপান ভারতবর্ষেই তাহা আবার ফিরাইয়া পাঠায়। ভারতবর্ষের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতর

জাপানের এই মোটা সূতার তৈরী গেঞ্জী প্রভৃতি জামার নীচে পরিবার রেওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতীয় 'কটন কমিটি' ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কল-কব্জায় কিছু পরিবর্ত্তন করিলে এই তুলা সেখানেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে মোটা বস্ত্র তৈরী করার উপযোগী প্রচুর তুলা জন্মায় এ কথাটা ল্যাঙ্কাশায়ারের জানিয়া রাখা দরকার এবং তাহা জানিয়া সেই অনুসারে কাজ করাও সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।"

ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়াল গবর্মেণ্টের একজন তুলার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি গবর্মেণ্টের কৃষিশালাগুলি পরীক্ষা করিয়া তুলার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা পুশা কৃষি-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক রিপোর্টের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের স্বার্থের দিক দিয়া কোনো লাভের চেহারাই এই রিপোর্টে ধরা পড়ে নাই। ভারতবর্ষের কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীদের ভিতর এমনও অনেকে ছিলেন যাঁহারা সাম্রাজ্যের স্বার্থের অপেক্ষা কৃষকদের স্বার্থের দিকেই বেশী নজর দিয়াছেন। কেমন করিয়া কৃষকেরা দুইটি বেশী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহারই দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এবং যেখানে লম্বা আঁশের তুলার চেয়ে ছোট আঁশের তুলায় কৃষকদের লাভের সম্ভাবনা বেশী দেখা গিয়াছে সেখানে ছোট আঁশের ভালো তুলাই তাঁহারা জন্মিতে দিয়াছেন, লম্বা আঁশের তুলা লইয়া অনর্থক পীড়াপীড়ি করেন নাই। ফলে লম্বা আঁশের তুলার ক্ষেত্রগুলিতেও কৃষকেরা বেশী লাভের আশায় ছোট আঁশের তুলা জন্মাইতে আরম্ভ করে। এমনি করিয়া লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্র ঢের কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষীদের চোখে গবর্মেণ্ট-কর্ম্মচারীদের এই অদ্ভুত অনাচার ধরা পড়িতেই তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রথমতঃ আইন করিয়া কৃষকদের এই কাজ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আইন তাহার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় নাই। এখন পর্য্যন্তও এ দেশের কৃষকদের খরচায় ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিকদের স্বার্থই বজায় রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। সে চেষ্টা যেমন হীন তেমনি লজ্জাকর। যাঁহারা এ দেশে তুলার চাষ এবং তুলার ব্যবসা করিতেছেন তাঁহাদিগকেও ইহাতে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। পরের অধ্যায়ে আমরা এসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় 'কটন কমিটি' ভারতীয় কৃষকদের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে তাঁহারা বলিয়াছেন, "যাহাতে কোনো রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্য আমরা বিশেষ জোর দিয়াই বলিতেছি, সর্ব্বাগ্রে আমরা ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করিয়াছি। আমরা এমন কোনো রকমের তুলার চাষই অনুমোদন করি নাই যাহাতে কৃষকদের স্বার্থের হানি হইতে পারে। স্থানীয় অবস্থা এবং কৃষকদের লাভ—এই দুইটি জিনিষই আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু ছিল। যাঁহারা আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারাও অন্য কোনোরূপ পথের নির্দ্দেশ করেন নাই।"

বাস্তবিক পক্ষে যাচাই করিয়া দেখিতে গেলে এই কমিটিতে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার কোনো সম্ভাবনাও নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের জন্য লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইবার উপায় উদ্ভাবন করা লইয়াই কমিটি আগাগোড়া ব্যস্ত ছিলেন। যেখানে সাম্রাজ্যের স্বার্থ এবং কৃষকদের স্বার্থে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে সেখানে কৃষকদের স্বার্থ লইয়া মাথা ঘামানো কমিটি কখনো সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। ৪র্থ অধ্যায়ে আমি সরকারী

কর্ম্মচারীদের কথা উদ্ধৃত করিয়াই কমিটির কথায় এবং কাজে যে কতখানি প্রভেদ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সাক্ষীর পর সাক্ষী হলপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, কৃষকদের স্বার্থের পক্ষে ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা অপেক্ষা ছোট আঁশের তুলার চাষই বিশেষ ভাবে উপযোগী। কিন্তু সে সব সাক্ষ্য উপেক্ষা করিতে কমিটি কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই এবং সেই সব সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা রায় দিয়াছেন, ভারতবর্ষে লম্বা তুলার চাষ কৃষকদের পক্ষেই লাভজনক। বস্তুত: ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার সঙ্কট দূর করিবার জন্যই যে কমিটির গোড়া-পত্তন এ রায় ছাড়া তাঁহাদের নিকট হইতে অন্য কোনো রায়ের আশাও করা যায় না। ভারতবর্ষের বিরাট ক্ষেত্রে লম্বা তুলার চাষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারকে তাহার সমস্যা-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করা অযাচিত ভাবেই ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য ছিল; অন্তত: রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারেরা তাহাই মনে করেন। ভারতবর্ষ যখন তাহা করে নাই তখন কমিটি যে তর্ক এবং যুক্তি জাল লইয়া অগ্রসর হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনোই কারণ নাই। ভারতীয় কৃষকদের শুভাকাঙ্ক্ষী এই কমিটিকে অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করা যায়,—কৃষকদের জন্য যদি তাঁহাদের দরদ এতই বেশী, তবে তাঁহারা মিলের কাপড়ের উপর যে শুল্ক বসানো হইয়াছে তাহা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা অনুমোদন করিলেন না কেন? দরিদ্র কৃষকেরা তাহা হইলে ত সস্তায় কাপড় কিনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত! চরকায় সূতা কাটার ব্যবস্থাটা অসম্ভব মনে হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা যে সর্ব্বপ্রকারেই অনুমোদনের যোগ্য তাহাতে ত সন্দেহ নাই। এ প্রশ্নের উত্তরে কমিটির কি বলিবার ছিল কমিটিই তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু এমন লোকেরও অভাব নাই যাহারা মনে করে, ভারতীয়

মিল যাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারে সেইজন্যই ভারতবর্ষের মিলের কাপড়ের উপর শুল্ক বসানো হইয়াছে এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের দিকে তাকাইয়াই তাঁহারা এই শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অবশ্য ইহারা যে দুষ্ট-বুদ্ধির লোক তাহাতে সন্দেহ নাই! নতুবা কমিটির উদ্দেশ্যের উপর এরূপ দোষারোপ করা কখনো সম্ভবপর হইত না। ভারতবর্ষের প্রতি এই ধরণের উচ্ছ্বসিত ভালবাসা সেই ক্লাইবের সময় হইতেই দেখানো সুরু হইয়াছে এবং তাহার জের এখন পর্য্যন্তও মেটে নাই। আমলা-তন্ত্রী গবমের্ণ্ট এখনও মনে করেন যে, সেই একই চালে তাঁহারা বাজিমাৎ করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা এখন দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের কৃষকদের প্রতি অপরিসীম স্নেহ থাকা সত্ত্বেও কটন কমিটি তুলার শুল্ক অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাঁহাদের অতি পেয়ারের কৃষকদের নিকট হইতেই প্রকৃত পক্ষে তুলার অর্দ্ধেক শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই কমিটিই ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা তৈরীর জন্য খুব জোরে কাজ চালানো অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই জোরে কাজ চালানোর অর্থ অনর্থক অর্থ ব্যয়। British Cotton Growing Association যে খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তাহা আমরা জানি এবং একথাও জানি যে, এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে সেই সব ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত কারবার করিয়াই ধন-কুবের হইয়াছেন। তথাপি যে-ব্যবস্থা প্রকাশ্য ভাবেই কেবলমাত্র ল্যাঙ্কাশায়ারকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারও অর্দ্ধেক খরচ যোগাইতে হয় দরিদ্র ভারতবাসীকে, এ ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ

বলিয়াই হয়তো অনেকের মনে হইবে। কথাটা আরও একটু বুঝাইয়া বলিতেছি।

১৯১৭ সালে গবর্ণর জেনারেল ভারতীয় কটন কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের ভিতর লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্নের অতি প্রাচীন সমস্যাটির সমাধানে ভারতবর্ষও যাহাতে যোগ দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ভারতীয় কটন কমিটির অনুমোদনকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গঠিত হয় Central Cotton Committee. এই কমিটির কাজ চালাইবার জন্য অর্থের যাহাতে অনটন না হয় সেই উদ্দেশ্যে Cotton Cess Act (XIV of 1923) পাশ করিয়া তুলার উপর একটি শুল্ক বসানো হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মিলে ব্যবহৃত তুলার প্রতি বেলের উপর চারি আনা হারে এই 'সেস' আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় কাপড়ের মিলের উপর ট্যাক্স বসানো ভারতীয় কৃষকদের উপর ট্যাক্স বসানোরই অনুরূপ। কারণ ভারতীয় কৃষকেরাই বিশেষ ভাবে মিলের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষকদের উপর ইঁহাদের দয়া যে অসীম সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের মিল এবং ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী

বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের ফলে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য জন-সাধারণের নিত্য-সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কেন যে এই বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইল তাহার প্রকৃত কারণ অনেকেই জানিতে পারে নাই, জানিতে চেষ্টাও করে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতা এদেশের শিক্ষিত জনগণের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। তাঁহারা মদের মত এই সভ্যতার ক্লেদকে আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়াছিলেন। কল-কারখানা এই সভ্যতারই অঙ্গ। সুতরাং কল-কারখানার বাহিরের বৈচিত্র্যও তাঁহাদের চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছিল, তাহার ভিতরের বীভৎস নগ্নমূর্ত্তি তাঁহাদের চোখেও পড়ে নাই। তাঁহাদেব কল্পনার পথ-ঘাট জুড়িয়া বসিয়া ছিল এই কল-কারখানার মোহ। তাহা যে দেশের কুটীর-শিল্পকে ধ্বংস করিয়া আমাদের নিঃস্বতা নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে সে দিকে তাঁহাদের কোনোই খেয়াল ছিল না।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় কৃষকদিগকে কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞের আমদানী করা হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থার পিছনে তাঁহাদের যে মনোভাব কাজ করিতেছিল, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাহার ভিতর ভারতবর্ষের যাহা কিছু সমস্তই হীন—এই ধরণের একটা ধারণা ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ে না। ইহা অপেক্ষাও লজ্জাকর ব্যাপার হইতেছে এই যে, সে

সময়ের ভারতীয় নেতারাও গবর্মেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যবস্থাকে সত্যসত্যই ঘৃণার চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছিলেন। এমন কি, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা, ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে লজ্জাও অনুভব করিয়াছেন। বিদেশী পোষাকে সং সাজা, মদ্যপান করা—প্রভৃতি ব্যাপারেও সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সমাজ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আমরা ইংরেজদের অপেক্ষা হীন এবং চাল-চলনে, হাব-ভাবে, কথায়-বার্ত্তায়, কাজে-অকাজে ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ করিলেই তাহাদের সমান হওয়া যাইবে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ তখনকার দিনে এই ধারণার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী মিলের মালিকেরা পাত্‌লা কাপড়ের বিনিময়ে ভারতের ধন আহরণ করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশীদের অনুকরণে এ দেশেও মিল বসাইতে হইবে—এই অনুকরণের মোহ হইতেই এ দেশেও মিলের উদ্ভব। মিল প্রতিষ্ঠিত হইল, সূতা কাটার কলও অজস্র বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই ফাঁকে চরকা যে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে সে দিকে আমাদের অতি সাবধানী রাজনীতিকেরাও খেয়াল করেন নাই। বিলাতী সভ্যতার মোহে তাঁহারা এতই মুগ্ধ যে, এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও তাঁহাদের মনে জাগিবার অবকাশ পাইতেছে না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে সূতা কাটিতেন, আর এই অবসর সময়ের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে গোটা পরিবারের বস্ত্রের সংস্থান হইত। কিন্তু মিলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চরকার প্রয়োজনও শেষ হইয়াছে। এখন তাহাদের অবসরের সময় আলস্য-বিলাসে, বাজে কাজে, খোস-গল্পে নষ্ট হয়; আর চরকার দৌলতে বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা যে একটা মোটা অর্থের হাত হইতে সংসারকে রক্ষা করিতেন সে অর্থও বিদেশী বণিকদের

অর্থ-ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। মিলের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া এ দেশের নারীদের সেই অবসরের শিল্পটাকে কেন নষ্ট করা হইবে, যে অর্থে দরিদ্র সংসারের বস্ত্রের সংস্থান হইত সে অর্থে কেন মিল বা বিদেশী বণিকদিগকে পুষ্ট করা হইবে—চরকা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রশ্নই আমাদের দেশ-হিতৈষীদের মনকে নাড়া দিত, যদি তাঁহাদের মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশী সভ্যতার ফেনিল মদে তাঁহাদের মগজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কখন, কেন, কাহার দোষে চরকা যে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহার খোঁজ লওয়াও তাঁহারা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়াই লইয়াছিলেন, পুরাণো প্রথা পুরাণো বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে। জীর্ণ কঙ্কালের উপর চূণকাম করিয়া তাহার ভিতরে প্রাণ-সঞ্চার করা যায় না—চরকাকেও ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা বৃথা। চরকার কঙ্কাল জীর্ণ হইয়াছে কিনা, যে ধৈর্য্য, স্বাতন্ত্র্য এবং বিশ্লেষণ-শক্তি থাকিলে তাহা যাচাই করিয়া দেখা যায়, সমগ্র জাতি বিদেশী সভ্যতার মদে মাতাল হইয়া তাহাও হারাইয়া বসিয়াছিল এবং এখনও সে মোহ হইতে তাহারা মুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এদেশে চরকার এই দুর্দ্দশা হইলেও এ দুর্দ্দশা তাহার সর্ব্বত্র হয় নাই। এই কল-কারখানার যুগেও চীনে চরকা খুব জোরেই চলিতেছে। চীনের ক্ষেতে দিনের পর দিন যেমন তুলার চাষ বাড়িতেছে তেমনি বাড়িতেছে চরকার ব্যবস্থা। চীনে যে কল একেবারেই দেখা দেয় নাই তাহা নহে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সিমোনোসেকি সন্ধির ফলে কয়েকটি মিল সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার বেশীর ভাগ তুলাই অসংখ্য চরকা এবং তাঁতকে পরিপুষ্ট করিতেছে। ভারতবর্ষের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুতথফা ট্যাক্স এবং অন্যান্য হাজার রকমের

অত্যাচারে এ দেশে চরকার শিল্প যখন ধ্বংস হইতেছিল আমরা নিজেরাও সেই সময় মিল প্রভৃতির উপর ঝোঁক দিয়া সেই ধ্বংসকে আগাইয়া দিয়াছি। মিলের অনুগ্রহে কুলী-মজুরদের কাজ মেলে এবং অংশীদারদের ঘরে ভাগের টাকা আসিয়াও জমায়েৎ হয় কিন্তু অবসর সময়ে ঘরের মেয়েরা সূতা কাটিয়া দেশের যে সম্পদ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল সে সম্পদের সন্ধান মিল দিতে পারে না। পুরুষের অর্থোপার্জ্জনের পথ অজস্র। কিন্তু নারীদের উপার্জ্জনের পথ দুই একটির বেশী নাই। চরকা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া জাতির অর্দ্ধেক লোকের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করা হইয়াছে।

কৃষকদের ভিতর মিলের কাপড়ের ব্যবহার আরম্ভ হইতে দেখিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এবং কলিকাতায় মিলের প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের উপর ল্যাঙ্কাশায়ারের অপ্রতিহত প্রভাব এ দেশের মিলের দ্বারা খর্ব্ব হয়, ইংলণ্ড তাহা কখনো সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য এদেশের মিল সেই হইতেই ইংরেজদের বিষ-নজরে পড়িয়া আছে। প্রথমে এই সব ভারতীয় মিল সাধারণতঃ মোটা সূতাই প্রস্তুত করিয়া জাপান এবং চীনে রপ্তানী করিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মিলের সংখ্যা ছিল সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮টি। এই সব মিলে একটি করিয়া তাঁতের সহিত ১১৩ করিয়া টাকুর ছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে টাকুরের সংখ্যা ঢের বাড়িয়াছে কিন্তু তাঁতের সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়ে নাই। সুতরাং সূতা কাটার পরিমাণ বাড়িলেও বস্ত্র-বয়নে তাহা নিযুক্ত হইতে পারে নাই, রপ্তানীতেই তাহার অধিকাংশ ব্যয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মিলগুলিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের মালিকেরা যে কিরূপ নেক-নজরে দেখিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের রাজস্ব-নীতির ভিতরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাজস্ব-নীতি আলোচনা করিলে অনেক অদ্ভুত রহস্য ধরা পড়ে।

ষষ্ঠ তালিকা

তুলা ও বস্ত্রের উপর শুল্কের হার পরিবর্ত্তনের বিবরণ—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বৎসর	তুলার উপর শতকরা আমদানী-শুল্ক	সূতার উপর শতকরা আমদানী-শুল্ক	বস্ত্রের উপর শতকরা আমদানী-শুল্ক	ভারতীয় মিলে তৈরী বস্ত্রের উপর শতকরা শুল্কের হার	মন্তব্য
১৮৬০	নাই	১০	১০	নাই	
১৮৬১	—	৫	১০	—	
১৮৬২	—	৩½	৫	—	
১৮৭১	—	৩½	৫	—	সূতা ও কাপড়ের দামের পড়তা কমানো হইয়াছিল।
১৮৭৫	৫	৩½	৫	—	যে সমস্ত কোরা মোটা বিদেশী বস্ত্রের সহিত ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা ছিল তাহার উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া লওয়া হয়।
১৮৭৯	৫	৩½	৫	—	৩০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতায় বুনানো বিদেশী কাপড়ের উপর হইতে আমদানী-শুল্ক তুলিয়া লওয়া হয়।
১৮৯৬	৫	৩½	৩½	৩½	

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সূতা এবং বস্ত্রের আমদানী-শুল্ক ছিল শতকরা ১০ টাকা। তাহার পর হইতে ভারতবর্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্যের বাজার প্রশস্ততর করার উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ক্রমাগত কমানো হইয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সূতার আমদানী-শুল্ক কমাইয়া শতকরা ৫ টাকা ধার্য্য করা হয়। তাহার পরের বৎসর এই শুল্ককে আরও কমানো হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি হয় নাই। বিলাতি বস্ত্র ও সূতার উপর শুল্ক বসানো তাঁহারা রক্ষণ-নীতির অনুসরণ করিয়া চলার সামিল বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়ীরা এই রক্ষণনীতি অবলম্বন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কারণ তাহাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য আসার পক্ষে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি ত হয়ই, তাহা ছাড়া ভারতীয় মিলের প্রসারেরও সাহায্য করে। সুতরাং 'ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্স' ভারত-সচিবের উপর খাপ্পা হইয়া অক্লেশে লিখিয়া বসিলেন :—

"এই সমস্ত শুল্কের ফল, ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় স্থানেরই প্রজার স্বার্থের যে কিরূপ পরিপন্থী তাহা বোম্বাই হইতে সর্ব্বশেষে যে উপদেশগুলি প্রেরিত হইয়াছে তাহার দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এই উপদেশে বেশ স্পষ্ট রূপেই দেখানো হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের আমদানীর উপর, তাহার সূতা ও বস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া যে রক্ষণ-নীতির অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে বহু নূতন মিল প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে।" Despatch No. 15 of 1875—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History হইতে উদ্ধৃত।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন নূতন বাণিজ্য-আইন পাশ করা হইল তখন

বস্ত্রের উপরে শতকরা ৫ টাকা হিসাবে যে আমদানী শুল্ক বসানো হইয়াছিল তাহাকে স্পর্শ করা হইল না। কারণ উহার দ্বারা দেশী শিল্প সম্বন্ধে রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, এ ধারণা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও লম্বা আঁশের তুলার উপরে শতকরা ৫ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক বসাইতে গবর্মেণ্ট দ্বিধা করিলেন না। সূক্ষ্ম বস্ত্রেও ভারতের মিল সমূহ যাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতা করিতে না পারে সম্ভবতঃ তাহাই ছিল এই নূতন শুল্ক বসানোর উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার ফল অন্যদিক দিয়া তেমন সুবিধাজনক হইল না। এই আমদানী-শুল্ক বসানোর ফলে রাজস্বের আয় প্রায় ৮,০০,০০০ পাউণ্ড কমিয়া গেল। লর্ড নর্থব্রুক ল্যাঙ্কাশায়ারের লাভের অপেক্ষা রাজস্বের ক্ষতিটাই বড় করিয়া মনে করায় তাঁহাকে ১৮৭৬ সালে ইস্তাফা দিতে হইল। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের কর্ত্তাদের জুলুমে 'হাউস অব কমন্স' আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পাশ করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম্ম হইতেছে,"ভারতবর্ষে বস্ত্রের উপর বর্ত্তমানে যে আমদানী-শুল্ক বসানো হইয়াছে তাহা রক্ষণনীতির অনুরূপ—তাহা সুনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য-নীতিরও পরিপন্থী। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা অনুসারে এই শুল্ক তুলিয়া দেওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হইলেই তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে।"

লর্ড সেলিসবারী এই প্রস্তাব ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের কাছে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "আরো পাঁচটি মিলে কাজ চলিবার উদ্‌যোগ হইতেছে এই আশঙ্কাজনক ঘটনাটির উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না।" ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড সেলিসবারী ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতগুলি লইয়া আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি ভারতীয় কৃষকদের

দুঃখ সত্য সত্যই অনুভব করিতেন। ভারতীয় বাণিজ্য-নীতির নিন্দা করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে, "ভারতবর্ষের রাজস্ব-নীতির পরিবর্ত্তনের সময় কৃষকদের ঘাড়ে যত দূর সম্ভব কম রাজস্বের চাপ পড়ে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। পল্লীঅঞ্চলগুলিতে অর্থ খুবই কম, মূলধনও ব্যবসাতে বিশেষ খাটে না। কিন্তু সহরে এই অর্থের অভাব নাই, বিলাসিতায় তাহার অজস্র অর্থ নষ্ট হয়। সুতরাং সহরকে মুক্তি দিয়া পল্লী-অঞ্চল হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ যদি আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে ব্যবস্থা মোটেই সমীচীন ব্যবস্থা নহে। ভারতবর্ষের মত স্থানে যেখানে বিনিময়ে কিছু না দিয়া'ই রাজস্বের এত বড় একটা অংশ বিদেশে রপ্তানী হয়, সেখানে ক্ষতি আরও অসাধারণ। ভারতবর্ষের রক্ত যখন শোষণ করিতেই হইবে, তখন অস্ত্রাঘাত সেইখানেই করা উচিত যেখানে রক্ত জমা বাঁধিয়া আছে, অন্ততঃ যেখানে রক্ত খুব বেশী। যে অংশ রক্তের অভাবে ইতিপূর্ব্বেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে সে অংশে অস্ত্রাঘাত করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।"

চরকা এবং তাঁতের স্থানে মিল বসাইয়া ভারতবর্ষের ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব, ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। কিন্তু লর্ড সেলিসবারি সম্ভবতঃ তাঁহাদের ভিতরেই একজন ছিলেন, যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, মিলের দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার সম্ভব। কিন্তু যিনি ভারতবর্ষের রক্তপাতের কথাটা এমন তীব্র ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিই আবার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পাঁচটি মিলের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন—এ ব্যাপারটি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়।

ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সহিত ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতা

বন্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা তখনই চরমে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষের ব্যবহারের জন্য ভারতের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপরেও ট্যাক্স বসিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের Cotton Duties Actএর দ্বারা ভারতীয় মিলের তৈরী বস্ত্রের উপর শতকরা ৩½ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে।

এই ট্যাক্স বসানো সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কাপড়ের মিলের প্রসার বন্ধ হয় নাই। প্রথমে ভারতবর্ষের কলে সাধারণতঃ সূতাই কাটা হইত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে এই যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে অর্থাৎ Cotton Duties Act পাশ হওয়ার পর হইতে মিলে বস্ত্র-বয়নের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় মিল, এবং তাহার ভিতরের তাঁত ও টাকুরের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

সপ্তম তালিকা

ভারতবর্ষের সূতা কাটা ও বয়ন-শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা

১৮৭৯—৮০

বৎসর	মিলের সংখ্যা	নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	টেকুর সংখ্যা	টেকু ও তাঁতের অনুপাত
১৮৭৯-৮০	৫৮	৩৯,৫৩৭	১৩,৩০৭	১৪৭০৮৩০	১১৩
১৮৮৮-৮৯	১০৯	৯২,১২৬	২২,১৫৬	২৪৬৩৩৪২	১২১
১৮৯৮-৯৯	১৭৪	১৫৬,১৩২	৩৭,২২৮	৪৪৬৩৩৪২	১২০
১৯০৮-০৯	২৩৩	২৩৬,৮২৭	৭৪,৫৯২	৫৯৬৬৫৩০	৮০
১৯০৯-১০	২৪৫	২৩২,৩৮১	৮০,১৭১	৬১৪২৫৫১	৭৮
১৯১৩-১৪	২৬৪	২৬০,৮৪৭	৯৬,৬৮৮	৬৬২০৫৭৬	৬৯
১৯১৪-১৫	২৫৫	২৬০,৪৪০	১০৩,৩১১	৬৫৯৮১০৮	৬৪
১৯১৫-১৬	২৬৭	২৭৫,৮৭১	১০৮,৪১৭	৬৬৭৫৬৮৮	৬১
১৯১৬-১৭	২৬৭	২৭৭,২৭০	১১০,৮১২	৯৬৭০১৬২	৬০
১৯১৭-১৮	২৬৯	২৮৪,০৫৪	১১৪,৮০৫	৬৬১৪২৬৯	৫৮
১৯১৮-১৯	২৬৪	২৯০,২২৫	১১৬,০৯৪	৬৫৯০৯১৮	৫৭
১৯১৯-২০	২৬৩	৩০৫,৫১১	১১৭,৫৫৮	৬৭১৪২৬৫	৫৭
১৯২০-২১	২৫৫	৩২৮,১৫২	১১৭,৯৫৩	৬৭৫২৪৭৪	৫৬
১৯২১-২২	২৭১	৩৪১,৯৪৪	১২৮,৩১৪	৬৮১৪২৭৩	৫২
১৯২২-২৩	২৮৯	৩৫৬,৭৫৮	১৩৭,২৩৮	৭২৪৫১১৯	৫৩

উপরোক্ত তালিকার হিসাব অনুসারে মিলে টাকুরের অনুপাতে তাঁতই বেশী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, মিলের কাটা সূতা

ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় মিলের ভিতরেই বস্ত্র-বয়নে ব্যবহৃত হইতেছে; এই তালিকা হইতে এ কথাটাও ধরা পড়ে যে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পরে নূতন কোনো মিলের সংখ্যা বাড়ে নাই বটে কিন্তু পুরাণো মিলগুলি তাহাদের কাজের ক্ষেত্র ঢের বাড়াইয়া লইয়াছে। গত ১৫ বৎসরে মিলের সংখ্যা ২৩৩টি হইতে বাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ২৮৯টিতে অর্থাৎ এই কয় বৎসরে মিলের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৪টি। তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৪ হাজার হইতে ১৩৭ হাজারে অর্থাৎ তাঁত শতকরা ৬৩টি বাড়িয়াছে। টাকুরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৯ লক্ষ হইতে ৭২ লক্ষে অর্থাৎ টাকুর শতকরা মাত্র ২২টি হিসাবে বাড়িয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই অনুপাতে ইংলণ্ড এমন কি তাহার টাকুরের সংখ্যাও বাড়াইতে পারে নাই। গত দশ বৎসরে নূতন টাকুর তাহার মিলে সংযুক্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাহার টাকুরের সংখ্যা ছিল ৫৬৩ লক্ষ এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ও ঠিক সেই সংখ্যাই রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও ইংলণ্ডের টাকুরের সংখ্যা ভারতবর্ষের অপেক্ষা অন্ততঃ নয় গুণ বেশী। ভারতবর্ষের শিল্পের ভিতর মিলের বস্ত্র-শিল্প বর্ত্তমানে খুব একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নিম্নে একটি তালিকায় ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে এই শিল্পটি কিরূপ ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে তাহার হিসাব খতাইয়া দেওয়া গেল।

অষ্টম তালিকা

ভারতের কাপড়ের মিলের বিবরণ, ১৯১৯—২০

স্থানের নাম	মিলের সংখ্যা	মূলধন (টাকা)	ডিবেঞ্চার	তাঁতের সংখ্যা	টেকুব সংখ্যা	গড়ে প্রতিদিন যতজন লোক কাজ করে পুরুষ	স্ত্রী	বালক	মোট
		(০০০ পরিত্যক্ত)							
বাংলা	১২	১৪৬৫৭	১৩৮৯	২৬৪৫	৩৪৫১৩৭	৮৪১৬	১৭০৪	২১০১	১২২২১
আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্ত প্রদেশ	১৭	১৩০৩১	৩০০	৪৪৫৫	৪৪৫২৭৭	১৩৬১৮	১০৬৪	১১০০	১৫৭৮২
আজমীব মাড়বার	২	১৩৪০		৬৬২	২২২১২	৮৮০	১৪০	১১০	১১৩০
দিল্লী	২	১৭০০		২২৮	২৯৬১৬	১১১৫	৭৯	১০৫	১২৯৯
পাঞ্জাব	৩	৭০০		২৮৭	৪৬৭৬৮	৯১০	১৪৭	১২৪	১১৮১
বোম্বাই	১৭৫	১৮৯৬৩৫	২৬৮২৭	৯৩৭৬৯	৪৭৪৬৫২৯	১৫৬২০৭	৪১৬৪৫	১৩০৬৯	২১১২২১
মধ্য প্রদেশ	৬	১৪৯১৫		৩৯৪৫	১৯৩৬০৮	৮৩৭৮	২২২৭	১৭০৩	১২৩০৮
বেরার	৩	৪৮০৫	৫০০	৯৮২	৪৬৭০৮	১৬৪৭	৩৫৩	৩৬৬	২৩৬৬
মাদ্রাজ	১৫	১২৬০২	৩২১৩	২৭২৭	৪২৩২৩২	১৫৭৯৬	৩৩৫৫	৪৯৬৭	২৪১১৮
ভারতীয় করদ-মিত্র ও স্বাধীন রাজ্য	২৮	১৭৩৯৬	৩৪২২৯	৮১৫৮	৪০৫১৭৮	১৫৬১৭	৩৯৩৩	৪৩৩৫	২৩৮৮৫
মোট	২৬৩	২৭০৭৮৩	৬৬৪৭৮	১১৩৫৫৮	৬৭১৪২৬৫	২২২৮৮৪	৫৪৬৪৭	২৭৯৮০	৩০৫৫১১

বোম্বাই প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মিল গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের ২৮৯টি মিলের ভিতর ২০০টি মিলই বোম্বাইএ প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের যে সব স্থানে তুলা জন্মায় বোম্বাই সেই সব স্থানের নিকটতম বন্দর। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বোম্বাইএর একটি স্বাভাবিক সুবিধাও আছে। কাপড়ের মিলে ভারতবর্ষে তিন লক্ষ লোক কাজ করে। এই তিন লক্ষের ভিতর পুরুষ ২'২ লক্ষ, নারী '৫৪ লক্ষ, বালক '২৭ লক্ষ। এই লোকের দ্বারা যে বস্ত্র এবং সূতা প্রস্তুত হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

নবম তালিকা

ভারতীয় মিলের উৎপন্ন সূতা, বস্ত্রের পরিমাণ ও প্রদত্ত শুল্কের বিবরণ

০০০ পরিত্যক্ত

স্থানের নাম	সূতা (পাউণ্ড ওজনে)		বস্ত্র (পাউণ্ড হিসাবে)		বস্ত্র (গজ হিসাবে)	
	১৯১৯	১৯২০	১৯১৯	১৯২০	১৯১৯	১৯২০
বোম্বাই	৮২৭৬৩৮	৪৩৯৭৯৯	২৭৫৮০১	৩০৬২৪৮	১১৯৭৪২১	১৩৫২৬০৬
মাদ্রাজ	৪২৭৮৭	৪৪৩৪৬	১৫৯৭৪	১৪২৫০	৪১৫১৮	৪৬৪১৪
বাংলা	৩২৫০৭	৩৫২২৯	৫২৪৭	৫৮৩৩	২৬৭১২	২৭৮৭১
আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্ত প্রদেশ	৪৩৯০	৩৫১৮১	১০৯৩৫	১০৪২৭	২৯৩৫৮	৩৫০২৯
আজমীর মাড়বার	২০৫৬	১৯৬৪	১৪৮২	১৫২৫	৫৭১১	৫২৭৫
পাঞ্জাব	৩৯১৯	৩৩৫৯	৬৭২	৩০২	২০১১	১২৪৬
দিল্লী	২৯৮১	৩২৮৬	৮৭০	৮৬৪	১৪৩৭	২০৪৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৩৪২৭৯	৩৪১৮৮	১৪৮০১	১৬২২৮	৫৯২৮০	৬৩৯৫০
ভারতীয় করদ-মিত্র ও স্বাধীন রাজ্য	৩৪৪৭৯	৩৮৪ ১	২৩৭৯১	২৮১৬৫	৮৬৯৭৯	১০৫৩২৯
মোট	৬১৫০৪০	৬৫৫৭৬০	৩৪৯১৮০	৩৮৩৮৪৬	১৬৫০৭২৬	১৬৩৯৭৭৯

স্থানের নাম	বস্ত্রের দাম (টাকা)		বস্ত্রের উপর প্রদত্ত শুল্ক	
	১৯১৯	১৯২০	১৯১৯	১৯২০
বোম্বাই	৩৬৬৩৫১	৪৮১০৫৩	১১৬১৮	১২৮৬৬
মাদ্রাজ	১৯০৮১	২২২৯৯	৭৪৮	৭৬৭
বাংলা	৬৮৯০	৯২৪৮	২১০	৩৩২
আগ্রা-অযোধ্যা-সংযুক্ত প্রদেশ	১২৭৫৯	১৪৪৪৮	৪৪০	৫৩৩
আজমীর মাড়বার	১৮৫৯	২২৫০	৬৭	৭৮
পাঞ্জাব	৭৮২	৪৫২	২৩	২৩
দিল্লী	৯৭১	১৩১৪	৩৩	৪৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৯৫১৯	২৩৯৯২	৬৭৫	৮৬৬
ভারতীয় করদ-মিত্র ও স্বাধীন রাজ্য	১৬৩৭৪	২৩০২৫	৫০৭	৮৯০
মোট	৪৭৪৫৯০	৫৭৮০৮৫	১৪৩২৪	১০৪০৫

মোটামুটি ভাবে ধরিতে গেলে সারা ভারতবর্ষে ৬৩'৫ ক্রোর পাউণ্ড সূতা তৈরী হয় এবং এই সূতার ৩৮'৩ ক্রোর বস্ত্র-বয়নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় দৈর্ঘ্যে তাহার পরিমাণ ১৬৩'৯ ক্রোর গজ। কেবলমাত্র এই সূতার দামই ৫৭'৮ ক্রোর টাকা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই বস্ত্র ব্যবসায়ে কয়েক জন মিলের মালিক ১৬' কোটী টাকা লাভ করিয়াছেন। এই বৎসর মিলের মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৭ ক্রোর মুদ্রা। যুদ্ধের পরেও বস্ত্র-ব্যবসা হইতে মিলের মালিকেরা যে লাভ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ এমনি অদ্ভুত! গত বৎসর তাঁহাদের লাভের পরিমাণ অবশ্য উপরোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সে লাভও খুব ছোট লাভ নহে। এই লাভে গবর্মেণ্টেরও ভাগ আছে। কাপড়ের মিল হইতে গবর্মেণ্ট প্রতি বৎসর শুল্ক বাবদ ১'৬ ক্রোর টাকা এবং ইনকাম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স বাবদ শুল্ক অপেক্ষাও অনেক বেশী টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। মিলের লাভ কোন এক ব্যক্তির ভাণ্ডার পুষ্ট করে না। তাহা কোম্পানীর অংশীদারদের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা হইয়া থাকে। এই অংশীদারদের পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা যদি মিলকে লাভের একটি যন্ত্র-বিশেষ বলিয়া মনে করেন তবে সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ব্যবসা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তিত ধারা অনুসারে মূলধনের সঙ্গে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ত্তমানের অংশীদারেরা যে অর্থ ব্যয়ে অংশ ক্রয় করিয়াছেন তাহার সামঞ্জস্য না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কোম্পানীর লভ্যাংশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অংশের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। যে অংশ ১০০ টাকায় কেনা হইয়াছে, কোম্পানী ২০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিতেই তাহার মূল্য ১৫০ টাকায় চড়িয়া বসে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি যদি তাঁহার

অংশ বিক্রয় করেন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশ ১০০ টাকার হইলেও তাঁহাকে লাভের পর্‌তা কষিতে হইবে ১০০ টাকার অনুপাতে নহে, ১৫০ টাকার অনুপাতে। এই ভাবে হিসাব করিতে গেলে কাপড়ের মিলে যদিও বৎসরে ২৭ ক্রোর টাকার মূলধন লাগানো হয় এবং এক বৎসরের যদিও তাহার লাভের অংশটা খুব প্রকাণ্ড হইয়াই দেখা দেয়, তথাপি অংশীদারগণ হয় তো সব সময়েই খুব বড় একটা লাভ চোখে দেখিতে পান না। তাঁহাদিগকে হয় তো ১০০ টাকা অংশ পাঁচ গুণ বেশী মূল্যে কিনিতে হয় এবং ১০০ টাকার লাভ প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের কাছে ২০ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা যে ক্ষেত্রে তাঁহাদের লাভের পরিমাণ অতিরিক্ত মনে করিয়া তাঁহাদের শোষণ ব্যবস্থার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকি, তাঁহারা লাভের পরিমাণটা হয় তো বেশী বলিয়া মনেও করিতে পারেন না। কিন্তু গবর্মেণ্ট নিজের বেলায় অতিমাত্রায় সেয়ানা। ইনকাম ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স প্রভৃতির বেড়াজাল ফেলিয়া আদত মূলধনের অনুপাতে গবর্মেণ্ট এই উচ্চহারের লভ্যাংশের বেশ বড় একটা অংশই পকেটস্থ করিয়া ফেলেন।

রপ্তানীর হ্রাস

রপ্তানী এবং উৎপন্নের সংখ্যাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় মিলের উৎপাদন-শক্তি প্রায় একই রকমের থাকিলেও রপ্তানীর পরিমাণ ঢের কমিয়াছে।

ভারতীয় মিলে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ ও তাহার রপ্তানীর বিবরণ

(০০০ পরিত্যক্ত হইয়াছে)

বৎসর	উৎপন্ন সূতার পরিমাণ (পাউণ্ড হিসাবে)	রপ্তানী করা সূতার পরিমাণ (পাউণ্ড হিসাবে)	রপ্তানী করা সূতার মূল্য (টাকা)	উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	রপ্তানী করা বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	রপ্তানী করা বস্ত্রের মূল্য (টাকা)
১৯১৪	৬৮২৭৭৬	১৯৭৯৭৮	৯৮৩২৩	১০৬৪৩০০	৮৯২৩৪	২১৩৬৯
১৯১৫	৬৫১৯৮৪	১৩৩৬১৯	৬২৮৬৪	১১৩৩৭০৭	৬৭১৯৪	১৫৮৭৭
১৯১৬	৭২২৪২৪	১৬০২৩১	৬৯২২৮	১১৪১৫১৪	১১৩৪৬৫	২৪৬৬৯
১৯১৭	৫৮১১০৭	১৬৮৯৭০	৭৯৪৯০	১১৭৮১৩২	২৬৩৮৪৫	৫৪৭৬২
১৯১৮	৬৬০৫৭৫	১২১৭৯৮	৭৫৬৪৭	১৬১৪১২৬	১৮৯৪৫০	৫৫৩৮২
১৯১৯	৬১৫০৪০	৬৩৭৯৮	৭২২৩৩	১৪৫০৭২৬	১৪৯১০০	৬৪৫২৬
১৯২০	৬৩১৭৬০	১৫১৮৭০	১৮২৫৯২	১৬৩৯৭৭৯	১৯৬৬০০	৮৭৩৬২
গড় পড়তা হিসাব ১৯১৪ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত	৬৬৪২৩৮	১৪২৬১০	৯১৪৮২	১৪৩২০৪০	১৪২৬৯৪	৪৬২২১
১৯২১	৬৬০০০২	৮২৫৩১	১০১৭১৫	১৫৮০৮৫০	১৪৬ ০০	৭৫০৬৩
১৯২২	৬৯৩৪৬২	৮১০৩৩	৭৭১৪৫	১৭৩১৫৭৩	১৬১০০০	৭৪৮০৫
১৯২৩	৭০৫৮৭৩	৫৬৮৬১	৫৪৭৭৬	১৭২৫২১৮	১৫৫৯০১	৭০৩৩৫
গড় পড়তা হিসাব ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত	৬৮৬৪৪৬	৭৩৪৭৬	৭৭১৪২	১৬৭৯২১৪	১৫৫৫১৪	৭৩০৬৮

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৯১৪ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত সাত বৎসরে গড়ে ১৪·২ ক্রোর পাউণ্ড ওজনের সূতা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ১৯২১—২৩, এই তিন বৎসরে সূতার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল গড়ে ৭·৩ ক্রোর পাউণ্ড। অর্থাৎ বৎসরে ৬·৯ ক্রোর পাউণ্ড সূতা শেষের কয়েক বৎসরে কম রপ্তানী হইয়াছে। এই কম্‌তির কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া বস্ত্রের রপ্তানী বাড়ার দোহাই দিলে চলিবে না। কারণ শেষের কয়েক বৎসরে বস্ত্রের রপ্তানীও বাড়ে নাই। ১৯১৪-১৯২০ পর্য্যন্ত সাত বৎসরে গড়ে কাপড়ের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৫·২ ক্রোর গজ, কিন্তু পরের তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯২১-১৯২৩ পর্য্যন্ত রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫ ক্রোর গজ। সুতরাং শেষের তিন বৎসরে রপ্তানী কমিয়াছে এবং মিলের উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই কয় বৎসরে প্রচুর (৭·৮ ক্রোর পাউণ্ড) সূতা রপ্তানীর পরিবর্ত্তে দেশের ভিতরেই মিলে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে এই পরিবর্ত্তনটির ভিতর একটি নিগূঢ় অর্থ পাওয়া যায়।

বিদেশী বস্ত্রের বয়কট

১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্রের বয়কট ঘোষণা করিলেন। সেই সময় হইতে মিলের কাপড়ের চাহিদা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁতে বস্ত্র-বয়নের জন্য সেই সময় হইতে এদেশে সূতার প্রয়োজনও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমস্ত খাদির কেবল মাত্র ‘পড়েনে’ চরকার সূতা ব্যবহৃত হয় তাহা তৈরী করিতে ‘টানায়’ কতটা মিলের সূতা

লাগিতেছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, তবে তাহার পরিমাণ যে খুব বেশী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মিশ্র খদ্দর এবং খাঁটি খদ্দর ছাড়া বাদ বাকী যে দেশী বস্ত্র তাহাই মিলে তৈরী হয়। বয়কট ঘোষণার ফলে বিদেশী সূতা এবং বস্ত্রের আমদানীতে যে ফাঁক পড়িয়াছে, এইরূপেই মিলের বস্ত্র ও খদ্দরের দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাঁতের কাপড়ের চাহিদা যেরূপ ভাবে এদেশে ধীবে ধীবে বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তাঁতেব সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়াইতে হইবে এবং তাহাতে মিলের সূতা নহে চরকার সূতাই ব্যবহৃত হইবে।

তাঁতের জন্য মিলের সূতা

তাঁতের অস্তিত্বেব সম্বন্ধে আমাদেব অনেকেরই ধারণা সুস্পষ্ট নহে। চরকার শিল্প নষ্ট হইলেও তাঁতের শিল্প একেবারে ধ্বংস হয় নাই। ল্যাঙ্কাশায়ার বা বোম্বাইএর মিল তাহাব যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা একেবারে চরম বলিয়া মনে করিবাব কোনো কারণ দেখা যায় না। মিলের তৈরী সূতার প্রায় অর্দ্ধেকই বস্ত্র-বয়নের জন্য তাঁতে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষ যদি আজ তাহার সমস্ত বস্ত্র তাঁতেই বুনিতে চায় তাহা হইলেও সেজন্য তাঁতের অভাব হইবে না। তাঁতিরা তাঁতে যে কতটা সূতা ব্যবহার করে নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

একাদশ তালিকা

তাঁতে ব্যবহারের জন্য দেশী ও বিদেশী সূতার পরিমাণ—পাউণ্ড হিসাবে (০০০ পরিত্যক্ত)

বিষয়		১৮৯৬-৯৭ হইতে ১৯০১-০২ পর্য্যন্ত গড়পড়্তা হিসাব	১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত গড় পড়্তা হিসাব	১৯১৭-১৮ হইতে ১৯২২-২৩ পর্য্যন্ত গড়্ পড়্তা হিসাব
১। আমদানী-করা সূতা	জলপথে	৪৪৯৫৬	৪১৭৪৯	৩৯৩৮৮
	স্থলপথে	১	৮০	২১
২। ভারতীয় মিলে তৈরী সূতা		৪৭৩০০০	৬৪৮৫৫৯	৬৬১৭৮৬
	মোট	৫১৭৯৫৭	৬৯০৩৮৮	৭০১১৯৫
৩। রপ্তানী-করা সূতা	জলপথে	২১৯৩৯৮	২০০৮৬১	৯৪২৪৩
	স্থলপথে	৭৬১০	১৪৬৬২	১১৭৯৩
	মোট	২১৭০০৮	২৫১৪৬৩	১০৬০৩৬
৪। ভারতে ব্যবহৃত মোট সূতার পরিমাণ		৩০০৯৪৯	৪৭৪৯২৫	৫৯৫১৫৯
৫। ভারতীয় মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ		৯৮৭২৯	২৪৮৯১৮	৩৮১৮৪৯
৬। ভারতীয় মিলের বস্ত্র বয়নে সূতার পরিমাণ		৮৮১৫১	২২১২৪৮	৩৪০৯৩৭
৭। তাঁতে ব্যবহৃত মিলের সূতার				

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায়, ১৯১৮ হইতে ২৩—এই ছয় বৎসরে গড়পড়তায় ৫.৯৫ ক্রোর পাউণ্ড সূতা (আমদানীর দ্বারা এবং রপ্তানী বাদে মিল হইতে) ভারতবর্ষে বস্ত্র-বয়নের জন্য পাওয়া গিয়াছে। এই সূতার ভিতর ৩.৪ ক্রোর পাউণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে মিলে এবং ২.৫ ক্রোর পাউণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে তাঁতে। তাঁতের দ্বারা এত সূতার ব্যবহার যে একটা বিরাট ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, চরকা ভারতবর্ষ হইতে একরূপ অদৃশ্য হইলেও তাঁত এখনও এ দেশে পূরা মাত্রাতেই চলিতেছে। এই শিল্পটাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখার পক্ষে আমাদের দেশের চেষ্টা হয় তো অনেকটা কাজ করিয়াছে, হয় তো মিলের চড়া দামও তাঁতিদিগকে প্রতিযোগিতা করিবার খানিকটা সুবিধা দিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ছাড়াও ইহার গূঢ়তর অন্য কারণও আছে। তাঁতের শিল্প এখনও যে নষ্ট হয় নাই, আমাদের নিজেদের রুচি তাহার একটা বড় কারণ। ভারতবর্ষের লোক সাধারণতঃ চারখানার কাপড় পছন্দ করে। একই বস্ত্রে নানা রঙের সূতার ব্যবহারের দ্বারা এই চারখানা তৈরী হয়। কলের তাঁতে নানা বর্ণের সূতা ইচ্ছা-মত ব্যবহার করার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। তাহাতে এক রঙের সূতা ব্যবহার করিতে করিতে অন্য রঙের সূতা ব্যবহার করিতে গেলে কল থামাইয়া মাকু বদলাইয়া লইতে হয়। সে ব্যাপারটা বেশ সময় সাপেক্ষ। সুতরাং কলের যে বিশেষত্ব অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কাপড় বোনা—চারখানা বুনিতে বসিয়া কলের তাঁত তাহা একেবারেই দেখাইতে পারে না। পদে পদে তাহার গতি ব্যাহত হয়। এ অসুবিধা যে-সব তাঁত হাতে চলে তাহাতে নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না কলের তাঁতের এই অসুবিধা অথবা আমাদের চারখানার প্রীতি দূর হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে তাঁতের শিল্প

ধ্বংস হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই। চারখানা এবং মশারীর কাপড় তাঁতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সত্য কিন্তু এ দুইটি জিনিস ছাড়াও অন্য কেন্দ্র হইতেও তাহার পুষ্টির রসদ জুটিতেছে। রেলের লৌহবর্ত্ম এবং সভ্যতার আলোক এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে সব সুদূর পল্লীতে পৌছিতে পারে নাই তাঁতের তৈরী মোটা কাপড় সে সব স্থানের বস্ত্রের অভাব এখনও পূর্ণ করিতেছে।

সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাবটা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় তবে তাঁতীরা পুনরায় চরকার কাটা সূতায় তাহাদের ব্যবসা আবার ঝালাইয়া লইতে পারিবে। এখানে হয় তো প্রশ্ন উঠিতে পারে —তাঁতের ব্যবসা যদি এইরূপে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে তবে মিলগুলির দশা কি হইবে? এ প্রশ্নের উপর মনোযোগ দেওয়ার বিশেষ দরকার নাই। কারণ ভারতবর্ষে কাপড়ের জন্য মিলের প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা মনে করি না। এখানে এখনও তাঁতের এত ওস্তাদ কারিগর আছে যে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তাহাদের দ্বারাই স্বচ্ছন্দে তৈরী হইতে পারে। এদেশের লক্ষ লক্ষ মা-বহিনেরা চরকায় যদি অবসর সময়েও সূতা কাটেন তবে প্রতি পরিবারের বস্ত্রের সূতা পরিবারের ভিতর হইতেই সংগ্রহ হয়। কেবলমাত্র বিদেশের বাজারে বস্ত্র-সরবরাহের ভার লইলেই প্রতিযোগিতার সমস্যা আসিয়া পড়ে, কিন্তু দেশের লোক যদি নিজেরা চরকায় সূতা কাটিয়া গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী স্থানের তাঁতিদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লয়, তবে প্রতিযোগিতার সমস্যা কোনো আকারেই দেখা দিতে পারে না, বেশী মূল্যের সমস্যাটাও পিছনে পড়িয়া থাকে। কারণ নিজের ঘরের কাটা সূতা দিয়া যদি বস্ত্র বুনাইয়া লওয়া হয় তবে মিল যত অল্প দামেই কাপড় সরবরাহ করুক না কেন, খরচা তাহাতে ঢের কম পড়িবে। সুতরাং ভারতীয়

বস্ত্রশিল্পকে নূতন জীবন দিতে হইলে মিলের কোনোই প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে কেবলমাত্র চরকার। ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার সাধু উদ্দেশ্য হইতে মিলের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার জন্মের ইতিহাসের পিছনে রহিয়াছে মানুষ এবং মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায়ীদের বড় হইবার ইচ্ছা। আর যদি কেহ সত্য সত্যই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য মিলের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহার গোড়াতেই যে ভুল রহিয়া গিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বস্ত্রের জন্য যে মিলের প্রয়োজন নাই তাহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। যাহারা ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য মিলের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের স্বার্থকেই প্রতিপদে লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছেন। অনেকে যুক্তি দেখান, মিলের প্রতিষ্ঠা না করিলে ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বাড়িতেই থাকিবে। এ যুক্তির মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। দেশের লোক বহু সময় আলস্যে অতিবাহিত করে। যে পথে চলিলে তাহাদের আলস্য বাড়িয়া উঠে সে পথ কখনো কল্যাণের পথ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এই আলস্য নিবারণের পথই কল্যাণের পথ। মিলের বস্ত্র দেশের লোককে আলস্য-বিলাসে সময় কাটাইবার সুবিধা যথেষ্ট দিতেছে তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের জাকজমকেও তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিতেছে—মনের স্বাধীন সহজ বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। দেশের এ অবস্থায় প্রত্যেক দেশ-ভক্তের কর্তব্য, মিলের মোহ হইতে দেশের লোকের মন ফিরাইবার চেষ্টা করা; চরকাকে ঘৃণা না করিয়া তাহাকেই যাহাতে দেশ সমস্ত মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা।

মিল অবশ্য দেশের অর্থের কতকটা অংশ দেশে রাখিতে সক্ষম

হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ কত সামান্য! তাহার অপেক্ষা যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের মত সে মিলের বস্ত্র বিদেশের বাজারে রপ্তানী করিতে পারিত, তবে ঢের বেশী লাভ হইত। কিন্তু এই রপ্তানীর কারবারও নৈতিক দিক দিয়া সমর্থনের যোগ্য কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা দেহে ও মনে একেবারে দাস বনিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্যের কল-কারখানা আমাদের মনের উপর যে স্পর্শ বুলাইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের মন একেবারে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া আছে। কোনোখানে জীবনের চিহ্নও দেখা যায় না। এ মোহ যে কি নিদারুণ সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যদি একবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তবে তাহার ভিতর আমাদের প্রতিবেশীদের টানিয়া আনা কখনো আমাদের সমর্থন লাভ করিবে না।

ভারতবর্ষের কাপড়ের রপ্তানীর কারবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ছিল সাধারণতঃ চীন ও জাপানের সঙ্গে। কিন্তু জাপানে বস্ত্র-বয়ন পূরা দমেই সুরু হইয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের মাল তো সেখানে প্রবেশ করিতে পারেই না, জাপানী বস্ত্রই ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চীনের অবস্থা অবশ্য খুব সুবিধাজনক নহে। বর্ত্তমানে খুব সঙ্গীন অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে। তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোনো কথা বলা না গেলেও, সরকারী হিসাব-পত্রের আলোচনার দ্বারা যাহা বোঝা যায় তাহাতে তাহার অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না।

চীনের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার জের

চীনের প্রায় সমস্ত সূতাই চরকার সূতা। মিঃ জন টড তাঁহার 'The World's Cotton Crops' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'দুনিয়ার তুলার বাজার সম্পর্কে একটি ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখার

মত। সেটি হইতেছে এই যে, চীনে উৎপন্ন সমস্ত তুলাই প্রায় তাহার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় হয়—তাহা হয় পারিবারিক প্রয়োজনের কাপড়, অথবা তুলার পোষাক প্রভৃতিতে লাগে, না হয়, স্থানীয় মিলে খরচ হইয়া যায়। চীনের এই স্থানীয় মিলগুলিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকুর আছে এবং চীনের উৎপন্ন তুলার প্রায় ৫ লক্ষ বেল এই সমস্ত মিলে প্রতি বৎসর খরচ হইয়া থাকে।" মিলে তুলার চাহিদা এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায়, মিঃ জন টডের এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, চীনে পারিবারিক ব্যবহারের বস্ত্রের সূতা প্রায় সমস্তই তাহার চরকাতে কাটা হইতেছে।

মিঃ ডানষ্টনের ১৯১০ খৃষ্টাব্দের Papers and Reports on Cotton Cultivation" নামক গ্রন্থে চীনের পারিবারিক চরকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথা কয়েকটি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। "ফলনের হিসাব-নিকাশের অবিদ্যমানে Imperial Maritime Customsএর রপ্তানীর হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া চীনে তুলার সমগ্র ফলনের সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করিয়া লওয়া যায়। চীনের তুলা যে কেবলমাত্র চরকা এবং তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রে পরিণত হইয়া স্থানীয় প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ১৮৯৫ সালের সিমোনোসেকি সন্ধির পর হইতে চীনে কয়েকটি কাপড়ের কল্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" সুতরাং চীনে যে অসংখ্য চরকা এখনও কাজে খাটিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও সেখানে মিলও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া নাই। তাহাও ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বৃদ্ধির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

চীনের কাপড়ের মিলে টাকুরের সংখ্যা—

১৯১০ খৃষ্টাব্দে	৭	লক্ষ টাকুর
১৯২০ „	১৪	„ „

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	১৮	লক্ষ টাকুর
১৯২২ ”	২৬	” ”

চীনে চরকার সংখ্যা যেমন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে, বাহির হইতে সূতা-রপ্তানীর সম্ভাবনাও সেখানে তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। মিলের প্রসারের ভিতর দিয়া সভ্যতার প্রসারের আভাস পাইয়া চীনের রাজনৈতিক নেতারা হয় তো উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সত্য সত্যই খুসী হইয়া উঠিবার উপযুক্ত মাল-মশলা ইহার ভিতর আছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষে এই সভ্যতা যে ফল প্রসব করিয়াছে চীনেও যদি তাহাই প্রসব করে তবে তাহা যে বিশেষ আনন্দের হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে যাহাই হোক্, চীনে মিলের প্রতিষ্ঠা যখন সুরু হইয়াছে তখন ভারতীয় মিলের বস্ত্রের রপ্তানীর ভবিষ্যৎ যে সেখানেও খুব উজ্জ্বল নহে, তাহার আভাস অস্পষ্ট বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

দ্বাদশ তালিকা

ভারতীয় মিলের তুলা, সূতা, মূলধন এবং লাভের
তুলনা-মূলক হিসাব

বৎসর		১৯১৪	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০
তুলার মূল্য প্রতি হন্দর (টাকা)		৩৮	৫৮	৮৪	৬৮
সূতার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে	”	।৵১১ পাই	॥/১১ পাই	১৵০	১৶০
মূলধন (লক্ষ হিসাবে)	”	৭৮০	—	১৩১০	১৬১০
লাভ (লক্ষ হিসাবে)	”	৮৯	—	১৩০৬	১৬৫৮

ভারতীয় মিলের তুলা, সুতা, মূলধন এবং লাভের
তুলনা-মূলক হিসাব

বৎসর		১৯২১	১৯২২	১৯২৩
তুলার মূল্য প্রতি হন্দর (টাকা)		৫৬	৫০	৫৯
সুতার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে	„	১৶০	৸৶০	৸৶০
মূলধন (লক্ষ হিসাবে)	„	১৬৬০	১৬৮৯	—
লাভ (লক্ষ হিসাবে)	„	১৬৩৯	৭২৭	—

ল্যাঙ্কাশায়ারেই হোক্ আর ভারতবর্ষেই হোক্, মিলগুলিতে কাজ যে কিরূপ ভাবে চলে তাহারই নমুনা স্বরূপ ১২ নম্বরের তালিকার কয়েকটি সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ১৯১৮ এবং ১৯১৯ এই দুইটি বৎসরের হিসাব লইয়া পরীক্ষা করিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। ১৯১৮ সালে তুলার দাম ছিল ৫৮ টাকা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই দাম বাড়িয়া ৮৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ তুলার দাম বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৫ টাকা হিসাবে। শ্রমিকদের মজুরীর হিসাব খতাইয়া দেখা যায় যে কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের মাহিয়ানা এ দুই বৎসরে সমানই ছিল। কয়লার দামেও কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। সুতরাং কেবলমাত্র তুলার দাম বাড়ার জন্যই সুতার দামও বাড়িয়া ॥৵১১ পাই হইতে ১৶০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে সুতার মূল্য বৃদ্ধি শতকরা ৮০ টাকা হারে হইয়াছে এবং ইহার জন্য মিলের যে লাভ হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা।

ইহার পরের বৎসরের অবস্থা আরো অদ্ভুত। সে বৎসরে তুলার দাম ৮০ টাকা হইতে নামিয়া ৬৮ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং মজুরী ও কয়লার দামের ভিতরেও কোনোরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

তথাপি সূতার দাম ১৶০ আনা হইতে বাড়িয়া ১৷৶০ আনায় উঠিয়াছিল। এ বৎসরে মিলের লাভ মূলধন অপেক্ষাও বেশী হয়। এই বৃদ্ধির কারণ, যে সব সূতা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় তাহা পূর্ব্ব বৎসরের মতই চড়া দামে বিকাইয়াছিল। আমদানী সূতার দাম বৃদ্ধির এই মাত্রায় আসিয়া পৌছিতেই ভারতবর্ষেও তাহার অনুসরণ সুরু হইয়া যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমদানী সূতার দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কয়েক মাস পরেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মিলগুলিও তাহাদের সূতার এই দামের নিরিখ ঠিক করিয়া দেয় এবং ইহার পরের কয়েক বৎসর সেই দামেই সূতার ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার চলিতে থাকে। ফলে একপক্ষ বিপুল লাভের অধিকারী হয় এবং আর পক্ষ ক্ষতির জের টানিয়া জেরবার হইয়া উঠে। এই মূল্য বৃদ্ধি কোন্ পক্ষের উপর কিরূপ ভাবে কাজ করিয়াছিল অতঃপর তাহার আলোচনা করিতেছি।

মিলের সহিত গবর্মেণ্টের লাভের বখ্রা

যখন মিলের তৈরী জিনিষের দাম খরচায় অনুপাতের মাত্রা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে এবং তাহার লাভ যখন শতকরা একশত টাকায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন যাহারা সে জিনিষ ক্রয় করে তাহাদিগকেই লোক-সানের ঝক্কি সহ্য করিতে হয়। দ্বিগুণ দামে তাহাদিগকে জিনিষ কিনিতে হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। ভারতবর্ষেও এ সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই। সুতরাং এদেশেও জিনিষ বিক্রয় করিয়া মিল অতিরিক্ত পরিমাণেই লাভ করিতেছে এবং সে লাভের পয়সা যোগাইতে হইতেছে, অনশন-ক্লিষ্ট, জীর্ণ-বাস দীন দরিদ্র ভারতবাসীকে। মিলের অংশীদারেরা লভ্যাংশ নিজেদের ভিতরে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছেন এবং

গবর্মেণ্ট তাঁহাদের লাভে ভাগ বসাইতে কসুর করিতেছেন না। বস্ত্রের মূল্যের উপর গবর্মেণ্ট শুল্ক বসাইয়া এই লাভ আদায় করেন তাহা ছাড়া 'সুপার ট্যাক্স' বাবদে তাঁহাদের বেশ একটা বড় রকমেরই লাভ হয়। ৫০,০০০ টাকার উপরে লাভ করিলেই প্রত্যেক কোম্পানীকে একটি অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হয়। সুতরাং কোম্পানীর লাভ যত বেশী গবর্মেণ্টের লাভের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষের জন-সাধারণের নিকট হইতে দেশী এবং বিদেশী মিলগুলির অর্থ-শোষণ গবর্মেণ্ট কেবলমাত্র নির্লিপ্ত ভাবে নিরীক্ষণ করেন না, তাহাতে তাঁহারা আনন্দের সঙ্গে ভাগও বসাইয়া থাকেন। ন্যায়ের মাপ-কাটিতে মাপিয়া দেখিতে গেলে এটা যে কত বড় অন্যায় কাজ তাহা বোঝা মোটেই কঠিন নহে। গমের রপ্তানীর জন্য যখন তাহার দাম বাড়িয়া গবর্মেণ্টের স্বার্থের হানি হইবার উপক্রম হয় তখন গবর্মেণ্ট তাহার মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করিতে ইতস্ততঃ করেন না কিন্তু মিলের শোষণের সময় এই মূল্য-বৃদ্ধি বন্ধ করিবার কথাটাও তাঁহাদের মনে পড়ে না। উপরন্তু দরিদ্রের রক্তের মত সেই লাভের অর্থে তাঁহারা ভাগ বসাইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষাও ক্ষোভের বিষয় এই যে, এত বড় একটা অন্যায় বিনা প্রতিবাদেই সাধিত হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা এবং তাহার দামের ইতিহাস জন-সাধারণের কাছ হইতে রহস্যের যবনিকা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। সুতরাং এই শোষণ তাহারা নির্ব্বিবাদেই সহ্য করে, প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।

লর্ড সেলিসবারি ভারতবর্ষের রক্ত-মোক্ষণের কথাটার উল্লেখ বলিয়াছেন, ছুরী যদি চালাইতেই হয়, তবে সেইখানেই চালানো উচিত যেখানে রক্ত অতিরিক্ত জমিয়া আছে। তিনি যে সময় এই

কথাটি ব্যবহার করিয়া ছিলেন সে সময় উহার আদত অর্থ কি ছিল তাহা আমি জানি না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহার সেই ইঙ্গিত সত্য সত্যই কাজে খাটানো হইতেছে। জাতি হিসাবে ভারতবাসীরা খুবই দরিদ্র। সোজাসুজি ট্যাক্স বসাইয়া তাহাদের গলায় মোচড় দিলেও বিশেষ কিছু মিলিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখানে গবর্মেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সোজা পথ নহে বাঁকাপথ। এমন লোক ভারতবর্ষে প্রচুর আছে যাহারা দরিদ্র কৃষকদিগকে ব্যবসার জালে ফেলিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছে। দরিদ্রদের রক্তে পরিপুষ্ট এই ব্যবসায়ীদের বুকে ছুরি চালাইবার ব্যবস্থা করায় লর্ড সেলিসবারির ইঙ্গিতটিই একটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহের সুবিধা পাইয়াছে। আমি একথা বলিতেছি না যে, গবর্মেণ্ট স্পষ্ট কথায় ব্যবসায়ীদিগকে অতিরিক্ত লাভের আশায় উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছেন। লাভের অঙ্কটাকে চরম সীমায় টানিয়া আনিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবের ভিতরেই নিহিত আছে। তাহার জন্য গবর্মেণ্টের উৎসাহ বা আর কাহারো ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বাভাবিক ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই এই লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস হইতে পারেন না। কারণ এই অন্যায় শোষণের দ্বারা অর্জ্জিত অর্থের অংশ যখন গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিতেছেন তখন তাঁহারা কেবলমাত্র অর্থই গ্রহণ করিতেছেন না, সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতরকার অন্যায়ের ভাগটাও গ্রহণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া এ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট তাঁহার দায়িত্বকেও অবহেলা করিতেছেন। গবর্মেণ্ট বাধা দিলে এ অন্যায় কখনো এরূপ নিদারুণ আকার ধারণ করিতে পারিত না।

মিলের তৈরী বস্ত্রের দাম যে সময়টাতে বাড়িয়া উঠিয়াছিল সে

সময়টাও ছিল খুব দুঃসময়। ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে তখন ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত। "চার পাঁচ মাসের ভিতর ব্রিটিশ ভারতের শতকরা দুইজন লোক এই ব্যাধির আক্রমণে পরলোকের পথে সে সময় নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে, যেমন মধ্য প্রদেশে দুই মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গিয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা ২২ বৎসরে প্লেগে যত লোক মারা গিয়াছে তাহার সমান।"* ১৯১৮—১৯ খৃষ্টাব্দের মহামারী লোকের মনে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিচয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক-গুনতির রিপোর্টের ভিতরেই আছে। ১৯১১ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ইনফ্লুয়েঞ্জায় এই চারি বৎসরের বৃদ্ধির চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। "ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপের মরশুমে এই ব্যাধির দ্বারা এক একটি গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। এমন সময়ও গিয়াছে যে মৃতদেহের সৎকারের কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্বারা অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় স্থানীয় সরকারী সাহায্যও বহু স্থানে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই ব্যাধি এরূপ একটা সময়ে দেখা দিয়াছিল যখন সারা দেশময় শস্যের অজন্মা একেবারে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তখনকার শোচনীয় দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই দুর্দ্দশা একেবারে চরমে পৌঁছিল নবেম্বর মাসে শীত দেখা দিতেই। সে সময় কাপড়ও সর্ব্বাপেক্ষা চড়া দামে বিকাইতে সুরু করিয়াছে। অনেকেরই শীত নিবারণের উপযোগী গরম কাপড় সংগ্রহ করিবার

---

* India in 1918—Government of India publication.

শক্তি ছিল না। আর সেই জন্যই ইনফ্লুয়েঞ্জা অত সহজে ফুস্ফুস আক্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" *

মিলের কাপড় এবং সূতা বিক্রয়ের দ্বারা যে অপরিমিত লাভ হইতেছিল, মিলের মালিকেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া চরকার সূতায় বোনা তাঁতের খদ্দরের উপরেও তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি বিস্তারে ইতস্তত: করেন নাই। মিলে খদ্দর তৈরী করিয়া তাহার বিক্রয়ও মিলের মালিকদের কারসাজিতে সুরু হইয়াছিল। এই অন্যায় ব্যাপারটিতে গবর্মেণ্ট বা ইংরেজদের অবশ্য কোনো হাত ছিল না। কারণ ভারতবর্ষে কাপড়ের মিলগুলির বেশীর ভাগেরই মালিক বিদেশী নহে—ভারত-বাসী। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্মেণ্ট Hand Book of Commercial Information নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য দেখা যায় তাহার একস্থানে আছে "বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ মিলের খদ্দর। মিল বিস্তৃতভাবেই খদ্দর প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।"

চরকা এবং তাঁতের বহুল প্রচলনের দ্বারা যদি পারিবারিক শ্রমের পথ পরিষ্কার রাখা হইত এবং কৃষকদের জমীতে তুলা উৎপন্ন করিয়া খদ্দর প্রস্তুত করার ব্রত ভারতবর্ষ গ্রহণ করিত তবে মিল যে ১৬ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে তাহা লাভ করিত এ দেশের দরিদ্র জন-সাধারণ। এই টাকায় দেশের কত বড় দুর্দ্দশাই না ঘুচিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দেশ-ভক্ত রাজনীতিকদের কেহই এই সহজ সরল পথটির দিকে নজর দিলেন না। তাঁহারা অন্ধের ন্যায় বাঁচিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথটির দিক হইতেও দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

* Census of India 1921, Vol. I, Report—page 13.

আমদানীর হ্রাস

মিলের সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় বিদেশী বস্ত্রের আমদানী যে কমিতেছে এ কথাটারও উল্লেখ করা আবশ্যক। বিদেশী সূতা এবং বস্ত্রের দাম খুব বেশী মাত্রায় না কমিলেও বিদেশী বস্ত্রের আমদানী যে বেশ কমিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বয়কট আন্দোলন যদি রীতিমত ভাবে পরিচালিত করা যাইত তবে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়াও হয় তো অসম্ভব ছিল না। কাপড়ের অত্যধিক দামের সঙ্গে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কমার একটা সম্পর্ক আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নহে। বয়কট আন্দোলনও এই আমদানী কমিয়া যাওয়ার একটা বড় কারণ। একান্ত প্রয়োজনে না পড়িলে বিদেশী বস্ত্র স্পর্শ করে নাই, এই আন্দোলনের সময় এরূপ অনেক ভারতবাসীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ তালিকা

দেশী বস্ত্রের উৎপত্তি, রপ্তানী ও ব্যয়ের পরিমাণ এবং
বিদেশী সূতা ও বস্ত্রের আমদানীর হিসাব, ১৯১৪ এবং ১৯১৭-২৩

০০০ পরিত্যক্ত হইয়াছে

আমদানী

বৎসর	১ সূতার পরিমাণ (পাউণ্ড হিসাবে)	২ সূতার মূল্য (টাকা হিসাবে)	৩ বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	৪ বস্ত্রের মূল্যের পরিমাণ (টাকা হিসাবে)
১৯১৪	৪৪১৭১	৪১৬০০	৩১৫৯৩০০	৫৮১৪০০
১৯১৭	২৯৫৩০	৪০৪৮৯	১৮৯১৭০০	৪৫৬৪৬৪
১৯১৮	১৯৪০০	৪২৯৫২	১৫২৩৪০০	৪৯৭২৫০
১৯১৯	৩৮০৯৫	৮৩৬৬৩	১১২২০০০	৪৯৪০০০
১৯২০	১৫০৯৭	৪৩৫৯৫	১০৮০৭৪৮	৫১৭৬০০
১৯২১	৪৭৩৩৩	১৩৫৭৮৩	১৫০৯৯২০	৮৩৭৮০০
১৯২২	৫৭১২৫	১১৫১২২	১০৮৯৮০০	৪৩১৬০০
১৯২৩	৫৯২৭৪	৯২৫৮৫	১৫৭৭৩০০	৫৮৫১০০

বস্ত্রের উৎপত্তি, রপ্তানী ও ব্যয়

বৎসর	৫ ভারতের মিলে তৈরী বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	৬ ভারতের তাঁতে তৈরী বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	৭ মোট উৎপন্ন ও আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	৮ রপ্তানী-করা বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)	৯ দেশে ব্যবহৃত বস্ত্রের পরিমাণ (গজ হিসাবে)
১৯১৪	১১৬৪৩০০	১২৭২২৩২	৫৫৯৫৮৩২	৮৯২৩৪	৫৫০৬৫৯৮
১৯১৭	১৫৭৮১৩২	৯১৬১১২	৪৩৮৫৯৪৪	২৬৩৮৪৫	৪১২২০৯৯
১৯১৮	১৬১৪১২৬	৯৭৫০১৬	৪১১২৫৪২	১৮৯৪৫০	৩৯২৩০৯২
১৯১৯	১৪৫০৭২৬	১২৪১৯০৮	৩৮১৪৬৩৪	১৪৯১০০	৩৬৬৫৫৩৪
১৯২০	১৬৩৯৭৭৯	৭০০০৮০	৩৪২০৬০৭	১৯৬৬০০	৩২২৪০০৭
১৯২১	১৫৮০৮৫০	১৩২৯১৮০	৪২১৯৭৫০	১৪৬৪০০	৪০৭৩৩৫০
১৯২২	১৭৩১৫৭৩	১৩৮৭৬২৪	৪২০৬৯৯৭	১৬১০০০	৪০৪৫৯৯৭
১৯২৩	১৭২৫২১৮	১৫৫২৩০৪	৪৮৫৪৮২২	১৫৫৯০১	৪৬৯৮৯২১

ভারতবর্ষে কাপড়ের খরচ

এই তালিকাটির নয় নম্বরের অঙ্কগুলির দিকে একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের অনেকগুলি রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। দেশী বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণটাকে বাদ দিয়া, এ দেশের মিলের কাপড়, তাঁতের কাপড় এবং বিদেশ হইতে আমদানী-করা কাপড় একত্রিত করিয়া এই অঙ্ক-গুলি পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের নিজের ব্যবহারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কম বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এত কম কাপড় লাগার কারণ অনুসন্ধান করিলে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবটার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন লোকের প্রয়োজনের বহর কমাইয়া চরকার সূতায় তাঁতে বোনা খদ্দরের ব্যবহারে ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কাপড়ের আমদানী কমার তাহাই যে একটা বড় কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
ভারতবর্ষে কাপড়ের খরচ ক্রোর গজ হিসাবে	৪১২	৩৯২	৩৬৬	৩২২	৪০৭	৪০৪	৪৬৯
জন-প্রতি কাপড়ের খরচ গজ হিসাবে	১২.৯	১২.২	১১.৪	১০.০	১২.৭	১২.৬	১২.৬

ভারতবর্ষে গত সাত বৎসরে মাথা-প্রতি কাপড়ের খরচ গড় পড়তায় ১২·৩ গজ করিয়া লাগিয়াছে।

চরকা কি করিতে পারে

চরকার সূতা এখন যেরূপ ভাবে কাটা হইতেছে তাহা মিলের সূতা অপেক্ষা ঢের মোটা। কিন্তু সূতা কাটায় অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালো সূতা যে উৎপন্ন হইবেই তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। বর্ত্তমানে চরকায় সাধারণতঃ ১০ কাউন্টের সূতা তৈরী হইতেছে এবং মিলে তৈরী হইতেছে ১১ কাউন্ট হইতে ২০ কাউন্টের ভিতর। এই মিলের সূতার ভিতর আবার ২০ কাউন্টের সূতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে তৈরী হয়। মিলের কাপড়ের চারি গজের ওজন যেখানে সাধারণতঃ ১৬ আউন্স হয় সেইখানে খদ্দরের ৪ গজের ওজন সাধারণতঃ গিয়া দাঁড়ায় ২০ আউন্সে।

৫ জন লোকের একটি পরিবারে বস্ত্রের জন্য বৎসরে যে সূতার প্রয়োজন হয়, পরিবারের এক জন লোক দুই ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটিলে সে সূতা সংগ্রহ করিতে পারে।

বৎসরে জন-প্রতি ১২ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়।

যে পরিবারে পাঁচ জন লোক, বৎসরে তাহাদের

কাপড়ের প্রয়োজন মোট ... ... ৬০ গজ

এই হিসাব অনুসারে এক মাসে একটি পরিবারের

বস্ত্রের প্রয়োজন ... ... ৫ গজ

১০ কাউণ্টের সূতায় তৈরী প্রতি গজ খদ্দরে ৪ আউন্স ওজনের সূতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ৫ গজ খদ্দরের জন্য সূতার প্রয়োজন হইবে ... ২৫ আউন্স

মাসে যদি ২৫ দিন সূতা কাটা যায় তবে ২৫ আউন্স সূতার জন্য প্রতিদিন সূতা কাটিতে হইবে ... ১ আউন্স

১ আউন্স সূতার ওজন ২½ তোলা। সুতরাং প্রতিদিন যে সূতা কাটিতে হইবে তোলা হিসাবে তাহার ওজন হইবে ... ... ২½ তোলা

১০ কাউণ্ট সূতার ২১০ গজে এক তোলা সূতা হয়। সুতরাং ২½ তোলা সূতার জন্য সূতার প্রয়োজন হইবে ... ... ৫৩০ গজ

যদি ঘণ্টায় ২৬০ গজে হিসাবেও সূতা কাটা যায় তাহা হইলে ৫৩০ গজ সূতা কাটিতে সময়ের প্রয়োজন হইবে ... ... ২ ঘণ্টা

তুলা পেঁজা প্রভৃতি ব্যাপারে সময় যায় দৈনিক ... ½ ঘণ্টা

সুতরাং একটি পরিবারের সমস্ত কাপড়ের জন্য দৈনিক পরিশ্রমের প্রয়োজন মোটের উপর ... ২½ ঘণ্টা

অর্থাৎ একটি পরিবারের প্রত্যেকে যদি সূতা কাটে তবে এই সূতা কাটায় প্রত্যেকের সময় দিতে হয় মোটে ... ... ½ ঘণ্টা

কোনো পরিবার সত্য সত্যই যদি নিজেদের বস্ত্রের জন্য মিল বা বিদেশী সূতার উপর নির্ভর না করিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া নিজেদের বস্ত্রের অভাব নিজেরাই মিটাইতে চায় তবে দৈনিক দুই ঘণ্টা মাত্র কাজ করিলেই তাহাদের সে সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে পারে। পরিবারের একটি-

মাত্র বোন যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এ ইচ্ছা অনায়াসেই কার্য্যে পরিণত হয়—সকলে করিলে তো কথাই নাই। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, আমরা সাধারণ পরিবারের কথা বলিতেছি। যে সব পরিবার সহরে বাস করে এবং প্রাচুর্য্যে, বাহুল্যে ও বিলাসে অভ্যস্ত আধ ঘণ্টা হিসাবে চরকায় সূতা কাটিলে তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন যে পূর্ণ হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ দেশের সাধারণ পরিবার বৎসরে কখনো ৬০ গজের বেশী বস্ত্র ব্যবহার করে না। এক গজ কাপড়ের দাম যদি গড়পড়তায় ॥১ আনা করিয়াও ধরা যায় তবে বৎসরে সমস্ত পরিবারের কাপড়ের খরচ আসিয়া দাঁড়ায় ৩০ টাকাতে। পাঁচ জন লোকের দ্বারা গঠিত সাধারণ একটি পরিবার এদেশে কাপড়ের জন্য বৎসরে ৩০ টাকার বেশী ব্যয় করে না—করিতে পারেও না। কৃষক পরিবারের পক্ষে এই হিসাবও আবশ্যকাতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ১২·৩ গজ করিয়া কাপড় গড়পড়তায় জন-প্রতি ধরিলে তাহার দ্বারা সাধারণ প্রয়োজন তো মেটেই, নৌকার পাল, ছাতার ঢাকনি, বই বাঁধাই করিবার কাপড়, সৈনিকদের তাঁবু, বড় লোকের বিলাস-বস্ত্র প্রভৃতিও পোষাইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ পরিবারের প্রয়োজন ১২·৩ গজের ঢের কম। চরকার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষের বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করা এতই সহজ যে, আমরা এখন পর্য্যন্ত যে এ কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না ইহাই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

তন্তুবায় সম্প্রদায়

১১ নম্বরের তালিকায় আমি দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষের নিজের বস্ত্রের জন্য যত গজ সূতার প্রয়োজন হয় তাহার অর্দ্ধেক ব্যবহৃত হয়

তাঁতে। সাধারণতঃ ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তায় জন-প্রতি ১২·৩ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়। নানা নজীর খতাইয়া দেখানো যায় যে, এই ১২·৩ গজ কাপড়ের ৪ গজ অর্থাৎ বৎসরে ৩২×৪ গজ কাপড় অন্ততঃ এই দেশের তাঁতিরাই তাঁতে বুনিয়া দেয়। তাঁতের শক্তি এই বস্ত্র-বয়নেই যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। চেষ্টা করিলে এখনও সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রই তন্তুবায়েরা যে স্বচ্ছন্দে সরবরাহ করিতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজের সুবিধা না থাকার দরুণই তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ চাষ-আবাদকে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯২১ সালের আদম-সুমারীর রিপোর্টের হিসাব-নিকাশটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ১৯১১ সালে যাহারা কাপড়ের ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ৮২ লক্ষ। ১৯২১ সালে এই সংখ্যাটা আসিয়া দাঁড়ায় ৭৮ লক্ষে। অর্থাৎ ১৯২১ সালে বস্ত্র-ব্যবসাতে লোকের সংখ্যা শতকরা ৫ জন হিসাবে কমিয়া গিয়াছে। মিলের বস্ত্র-বয়নের ব্যবসাতে যাহারা নিযুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। সুতরাং তন্তুবায় এবং তাহাদের পরিবারদের গণনা করিয়াই যে উপরোক্ত সংখ্যাটা পাওয়া গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ অধ্যায়

তুলার চাষ এবং ব্যবসা

চরকায় সুতা কাটা বন্ধ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে এদেশে তুলার চাষের সমাদরও ঢের কমিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত প্রদেশে তুলা জন্মায় সে সব দেশেও এখন আর কেহ গৃহ-শিল্প হিসাবে তুলা উৎপাদন করে না, তুলা উৎপন্ন করে মিলে বিক্রয় করিবার জন্য এবং বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য। সুতরাং তুলা ব্যবসার পণ্য ছাড়া দেশের লোকের মনে উপর এখন আর কোনোই প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে না। কিন্তু এ দেশে মিল প্রতিষ্ঠার আগে এবং রপ্তানী সুরু হইবার পূর্ব্বে তুলা ঠিক ব্যবসার পণ্য ছিল না। তাহাব জন্য এ দেশের লোক অন্য রকমের দরদ অনুভব করিত। তুলাব চাষ তখন কবা হইত ঘরে বস্ত্র বুনিবার জন্য। এই বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করিয়া যে তুলা অবশিষ্ট থাকিত তাহাই কেবল বাজারে বিক্রয়ার্থ নীত হইত। বিক্রীত তুলাও যে খুব বেশী দূর চলিয়া যাইত তাহা নহে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাদনেব প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে সুবাটের যে দূরত্ব ততটুকু দূরত্ব লইয়াও তুলার কারবার চলিত না। চাষীদেব কাছে এই সব জন্যেই তুলা ব্যবসার পণ্য অপেক্ষা পরিচ্ছদের উপাদান হিসাবেই একটু অন্য রকম সমাদরের সামগ্রী ছিল। কিন্তু চবকা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চাষীদের কাছে টাকার দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়া তুলার সঙ্গে এখন আর অন্য কোনো সম্বন্ধ নাই। অবস্থা এইরূপ হওয়ার ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে তুলা কেবল মাত্র গৃহ-শিল্পের প্রয়োজনের জন্য উৎপন্ন হইত সে সব অঞ্চলে তুলার

চাষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর যে সব অঞ্চলে এখনও তুলার চাষ চলিতেছে সে সব অঞ্চলে ব্যবসাদারী অতি-মাত্রায় দেখা দিয়াছে এবং তুলার ফলন বাড়াইবার জন্য ব্যবসায়ীরা কোনো পথ অবলম্বন করিতেই দ্বিধা করিতেছে না।

বাংলার তুলা

তুলার ফসল লাভ-জনক ফসল নহে। কেবলমাত্র সেই সমস্ত জমীই তুলার চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে সব জমীতে অন্য কোনো ফসল উৎপন্ন করিয়া লাভ করা যায় না। ধান এবং গমের তুলনায় তুলার চাষ ঢের ক্ষতিজনক হইলেও বর্ত্তমানের ব্যবসা-পদ্ধতি নানা কারসাজিতে তাহার দাম বাড়াইয়া দিয়াছে। ফলে কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্রে তুলার চাষ বাড়াইবার নানা রকমের পদ্ধতিও অবলম্বিত হইয়াছে। বাংলায় তুলার চাষ কোনো কালেই লাভজনক ফসল ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও বাংলায় তুলার চাষ হইত গৃহ-শিল্পের দ্বারা পারিবারিক বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে। বাংলায় যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত তাহার দ্বারা প্রাদেশিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভাবে মিটিত না। সুতরাং গৃহের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাকে বাহির হইতেও তুলা আমদানী করিতে হইত। কিন্তু যখন হইতে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া তুলা মিলের সিংহাসনে জাকিয়া বসিয়াছে তখন হইতে বাংলার যে জমিটুকুতে তুলার আবাদ হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।, এখন বস্ত্রের জন্য বাংলা মিলের উপরেই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। বাংলার গৃহ-শিল্পে তুলার স্থান নাই—তাহার জমীতেও তুলার ফসল ফলে না।

বাংলায় তুলার চাষের উল্লেখ করিয়া মিঃ মেডলিকট লিখিয়াছেন :—"যে সব প্রমাণ আমার নজরে পড়িয়াছে তাহার সমস্ত গুলিতেই আমি দেখিয়াছি যে, কেবলমাত্র স্থানীয় প্রয়োজনেই তুলা চাষ করা হইত। এই স্থানীয় শব্দের অর্থটাও খুব ব্যাপক ছিল না। এমন কি তুলা কদাচিৎ গ্রাম্য বাজারে বিক্রয়ার্থে নীত হইত। তুলার প্রধান ব্যবহার ছিল যাহারা উৎপন্ন করিত তাহাদেরই হাতে। তাহারা চরকায় সূতা কাটিয়া নিজেদের এবং পরিবারবর্গের ব্যবহারের বস্ত্র নিকটস্থ তাঁতির নিকট হইতে বুনাইয়া লইয়া আসিত।"

ইহা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বাংলার কৃষকেরা তুলা উৎপন্ন করিত এবং তাহার দ্বারা নিজেদেরই বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করিত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদেশী বস্ত্র দেশী শিল্পের স্থান বহুল পরিমাণে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু বাংলা বস্ত্র-শিল্পের সেই মরশুমের যুগেও তাহার প্রয়োজনের ⅔ ভাগের বেশী তুলা উৎপন্ন করিতে পারে নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না তাহার আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ তাহার মোট প্রয়োজনের ⅓ ভাগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল সে পর্য্যন্ত বাংলার কৃষকেরা তাহাদের নিজেদের তুলা নিজেরাই উৎপন্ন করিয়াছে এবং সেই তুলার দ্বারা চরকায় সূতা কাটিয়াছে। বাংলার তুলার চাষ তখনই শুধু লোপ পাইয়াছে যখন আমদানী বস্ত্রের প্রবাহে বাংলার বস্ত্র-শিল্প সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়া গিয়াছিল। এখন বাংলায় এরূপ জেলাও দেখা যায় যেখানকার গ্রামবাসীরা তুলার গাছের চেহারার সঙ্গেও পরিচিত নহে। সারা বৎসর ব্যাপিয়া ফল দেয় এরূপ তুলার গাছও বাংলায় ছিল। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছাড়া আজ তাহার সন্ধানও কেহ জানে না।

বর্ত্তমান বাণিজ্য-দানবের যাদু মন্ত্র এত বড় একটা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য হইতে বাংলাকে বঞ্চিত করিলেও ভারতবর্ষে এমন স্থানও আছে

যেখানে তাহারই খেয়ালে জমীর পর জমী নূতন করিয়া তুলার গাছে ভরিয়া উঠিতেছে।

তুলার সহিত পারিবারিক ব্যয়-সংক্ষেপের সম্বন্ধ

ভারতবর্ষে প্রায় ২৮ ক্রোর একার জমীতে চাষ-আবাদ ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ৩২ ক্রোর। সুতরাং মাথা-প্রতি হিসাব করা এক এক জনের ভাগে ০·৮৯ একার অথবা ৫৩ কাঠা জমী পড়ে। (এক একার=৬০ কাঠা অথবা ৭২০ স্কোয়ার ফুট) এই ২৮ ক্রোর আবাদী জমীর ভিতর তুলার চাষ হয় মাত্র ১·৮ ক্রোর একার জমীতে। সুতরাং মাথা-প্রতি ৩⅓ কাঠা জমীতে তুলার চাষ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক লোকের পক্ষে বৎসরে ১২ গজ হিসাবে বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই বস্ত্রের উপযোগী সূতার জন্য মাত্র দুই কাঠা জমীতে তুলা উৎপাদন করা দরকার। এই হিসাব অনুসারে জন-প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত ১⅓ কাঠা জমীতে এদেশে তুলার আবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এ দেশে শত করা ৪০ একার পরিমিত জমিতে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে লাগে না। সুতরাং এখানে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগ আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়াও আমরা রপ্তানী করিতে পারি।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের দাম অনুসারে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলার দাম ছিল ৯১ ক্রোর টাকা। সুতরাং শতকরা ৪০ ভাগ তুলা বিক্রয় করিয়া ৩৭ ক্রোর টাকা ঘরে আনার পরেও ইচ্ছা করিলে সে নিজের ব্যবহারের জন্য ৫৪ ক্রোর টাকার তুলা দেশে রাখিতে পারিত। কিন্তু ১৯২২

খৃষ্টাব্দের তালিকায় ঠিক উল্টা ব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। শতকরা ৬০ ভাগ রাখিয়া ৪০ ভাগ রপ্তানী করার পরিবর্তে ভারতবর্ষ ৪০ ভাগ রাখিয়া ৬০ ভাগ তুলাই রপ্তানী করিয়াছে। ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী করা তুলার মূল্য ছিল ৫৪ ক্রোর টাকা। আমাদের যেখানে ৩৭ কোটি টাকার তুলা রপ্তানী করা সঙ্গত ছিল সেই খানে ৫৪ ক্রোর টাকার তুলা রপ্তানী করায় ভারতবর্ষের পারিবারিক ব্যবহারে তুলা হইতে ১৭ ক্রোর টাকার তুলা আমরা বিদেশে চালান দিয়াছি। এই ১৭ কোটি টাকার তুলা বিদেশে পাঠানোর জন্য আমাদের যে বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে হইয়াছে তাহার দাম ৫৭ ক্রোর রজত মুদ্রা। আমাদের শক্তি থাকিলে এই ৫৭ কোটি টাকার বিদেশী বস্ত্র যাহাতে এদেশে আমদানী হইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রয়োজন অনুসারে দেশের তুলা যাহাতে দেশের কাজেই লাগানো যায় তাহারই চেষ্টা চলিত। বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিতে হইলে শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। আমাদের শুভাশুভের ভার আমাদের হাতে থাকিলে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর উপর এমন শুল্ক বসিত যে এক খণ্ড বিদেশী বস্ত্রও এদেশে ঢুকিতে পারিত না, পরিবারের ভিতর চরকায় সূতাকাটা আবার আরম্ভ হইয়া যাইত। বিদেশী বস্ত্র আমদানীর স্বপক্ষে একটি যুক্তিই সাধারণতঃ দেখানো হইয়া থাকে। সে যুক্তিটি হইতেছে এই—মিলের মালিকদের লাভ করার প্রবৃত্তির উপর একটা সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়ার জন্যই বিদেশী বস্ত্র আমদানী আবশ্যক। কিন্তু এ যুক্তি যে বিচার-সহ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের সহিত কোনোরূপ পরামর্শ না করিয়াই ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের মালিকেরা যদি বস্ত্রের মূল্য দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিতে পারেন এবং এই বৃদ্ধির কোনো সঙ্গত কারণ আছে

কিনা তাহা দেখানোও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের মর্জ্জিও যে কোনো মুহূর্ত্তেই ভারতবর্ষের পক্ষে সাজ্যাতিক হইয়া উঠিতে পারে। এই মর্জ্জির অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া থাকিবার কোনোই সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া বিদেশী বস্ত্র-শিল্পকে চরকা এবং তাঁতের দ্বারা নির্ব্বাসিত করিলে মিলের শোষণের আশঙ্কাটা অনায়াসেই দূর হইতে পারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম স্থমারীর রিপোর্টে গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র-সমস্যা সমাধান করার পথটাকে একান্ত ভুল পথ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি শিশুর যুক্তির মতই অদ্ভুত ও অন্তঃসারশূন্য।

তাঁহাদের প্রধান যুক্তি "প্রকৃতি তুলা এমন করিয়াই তৈরী করিয়াছেন যে তাহার চেহারার ভোল একেবারে ফিরাইয়া দিতে না পারিলে তাহার দ্বারা বস্ত্র তৈরী সম্ভব নয়। আর এই চেহারার পরিবর্ত্তনের জন্য চরকা মোটেই উপযোগী নহে। স্থতরাং চরকায় পারিবারিক বস্ত্র-সমস্যা মিটিবে না, মিটিতে পারে না।" বলা বাহুল্য গবমেণ্ট কর্ম্মচারীদের স্বার্থ ভারতীয় চাষীদের স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্থতরাং এই ধরণের ছেলে-ভুলানো যুক্তির অবতারণা করা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আমরা তাঁহাদের অপূর্ব্ব যুক্তি-জালের দুই একটা নমুনা দিতেছি।

আসাম-গবর্মেণ্টের মিঃ ট্যালেণ্টস্ "চরকা এবং তাঁতের অর্থনৈতিক স্থবিধার আলোচনা করিয়া তাহার খরচা এবং খরচার বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়—এই দুইটি জিনিষের পরিমাণের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, চরকার ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হইতে পারে না।" তিনি লিখিয়াছেন, "স্থতরাং এ জিনিষটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরকায় সূতা কাটার খরচা যদি কিছুই না-ও ধরা হয় তাহা হইলেও সে সূতা

ব্যবহারের দ্বারা তাঁতিদের মজুরী পোষাইবে না। চরকা এদেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধানের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যে কিরূপে সম্ভব, তাঁতিদের ব্যবসা যে কিরূপে মিলের সূতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে তাহা বোঝা কঠিন। মার্শেল বলিয়াছেন, বস্ত্রের উপাদান প্রকৃতির নিকট হইতে একেবারে আদিম অসংস্কৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহা বস্ত্রে পরিণত করিতে হইলে বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তাহাদের সংস্কার করিয়া লওয়া দরকার। তুলা এবং পশম এই উভয় জিনিষই যন্ত্রের চাপে নানা উপায়ে সংস্কৃত হইয়া উঠে এবং কেবলমাত্র এই সংস্কৃত অবস্থাতেই তাহাদের দ্বারা সূতা তৈরী করা সম্ভব। মার্শেলের এই কথার ভিতর অত্যুক্তি নাই।" *

একজন গোয়ালিনী যুক্তি দেখাইয়াছিল, ভগবান জল দুধের সঙ্গে মিশাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা দুধের সঙ্গে তেলই বা মেশে না কেন এবং জলই বা এত সুন্দররূপে মেশে কেন? সুতরাং দুধে জল মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। আসাম-গবর্মেণ্টের এই কর্ম্মচারীটির যুক্তি এই গোয়ালিনীর যুক্তিরই অনুরূপ। প্রকৃতি তুলা সৃষ্টি করিয়াছেন যন্ত্রের চাপে ফেলিয়া কাজের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সুতরাং যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া সূতা কাটিবার চেষ্টা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযানেরই সামিল।—এযুক্তি যে গোয়ালিনীর মতই বেপরোয়া ব্যবসাদারের যুক্তি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার পরে তিনি যুক্ত প্রদেশের আর একজন সরকারী কর্ম্মচারীর মত উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "গৃহ-শিল্পরূপে বস্ত্র-বয়নের ব্যবসা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কারণ সম্ভবতঃ গান্ধী-চরকা। এই আন্দোলন গান্ধী-চরকার

* Census Report, 1921. India Vol. I, part 1, page 270.

ব্যবহারের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছিল। অথচ এই চরকায় যে সূতা তৈরী হইয়াছে অসমতার জন্য তাহা একেবারে অব্যবহার্য্য।"

উপরোক্ত কথাগুলির সহিত আমাদের দেশের লোকেরা যে কিরূপ আলস্য-বিলাসের ভিতর পড়িয়া আছে তাহার ইতিহাসও জড়িত। তুলার রপ্তানী না করিয়া এবং বিদেশের বস্ত্র না কিনিয়া অথবা তুলা বিক্রী এবং বস্ত্র কেনা ব্যাপারে দেশী মিলের শরণাপন্ন না হইয়া এ দেশের কৃষক বধূরা যে নিজেদের পরিবারের বস্ত্রের উপযোগী সূতা নিজেরাই কাটিতে পারে তাহা বুঝিতে বিশেষ কল্পনার প্রয়োজন হয় না। এই বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়া বাকি সূতা বাজারে অনায়াসেই বিক্রী হইতে পারে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ভারত জুড়িয়া এই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল এবং চীনেও আজ এই ব্যবস্থাই চলিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে লোকের কাছে ব্যাপারটাকে সহজ-বোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য তুলার পরিমাণ আমি টাকায় কষিয়া দিয়াছি। কিন্তু এই টাকার অঙ্কের দ্বারা তুলার পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা নির্ভুল হয় না। কারণ দামের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটে এবং এ বৎসর যে টাকায় যে পরিমাণ তুলা পাওয়া যায় অন্য আর এক বৎসরে সে টাকায় সে পরিমাণ তুলা না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। অধুনাতন বৎসরগুলিতে দামের এই তারতম্য আরো বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সহিত বয়কট আন্দোলনকেও জুড়িয়া দেওয়ার ফলে তুলার ব্যবসাতে যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে বস্ত্রের আমদানীর ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের অঙ্ক-গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোঝা যায়।

বিদেশী বস্ত্রের আমদানী

১৯১৩-১৪	...	৬৬·৩০ লক্ষ	(যুদ্ধের পূর্ব্বে)
১৯১৯-২০	...	৫৯·০৮ ,,	(এই সময়ে দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে)
১৯২০-২১	...	১০২·১২ ,,	(ভারতবর্ষের বাজারে ইহা অপেক্ষা চড়া দরে আর কখনো বিদেশী বস্ত্র কাটে নাই। এই চড়া দাম আগের বৎসরের ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া মাত্র)
১৯২১-২২	...	৫৬·৯৪ ,,	

জাতি যদি বিদেশী বস্ত্রের বয়কট বেশ জোরের সহিত চালাইতে পারে তবে এই অঙ্ক যে ক্রমাগতই কমিয়া আসিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলার রপ্তানীর অঙ্কটার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধেক তুলাই জাপানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু এক দেশে রপ্তানী-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত করার বিপদও আছে ঢের। এই ধরণের বাণিজ্য-সম্পর্কীয় বড় বড় ব্যাপারগুলি গবর্মেণ্টের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। জাপান ইচ্ছা করিলেই তাহার বাণিজ্য-নীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। কারণ ভারতবর্ষের গবমেণ্ট জন-সাধারণের মতের দ্বারা পরিচালিত হয় না। সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত না ভারতবর্ষের শাসন-নীতির ধরণ বদলাইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের কৃষকদের বিপদও কাটিতেছে না।

তুলার ফলনের পরিমাণ এবং রপ্তানী

৪০০ পাউণ্ড ওজনের বেল হিসাবে

	১৯২১		১৯২২		১৯২৩	
উৎপন্ন	৩৬·০	লক্ষ	৪৪·৮	লক্ষ	৫০·৭	লক্ষ
মোট রপ্তানীর পরিমাণ	২০·৭	"	২৯·৮	"	৩৩·৬	"
জাপানে রপ্তানী	৯·৩	"	১৭·৬	"	১৬·২	"
ভারতীয় মিল এবং পারিবারিক ব্যবহারের জন্য অবশিষ্টাংশ	১৫·৭	"	১৫	"	১৮	"

সুতরাং ভারতবর্ষের মিল যে পরিমাণ ভারতীয় তুলা খরচ করিতেছে জাপানের মিলেও সেই পরিমাণেই ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইতেছে।

তুলার চাষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমান ভাবে করা হয় না। কোনো কোনো প্রদেশে যেমন বাংলায় (কেবলমাত্র পার্ব্বত্য জাতির ভিতর ছাড়া) তুলার চাষ নাই বলিলেও চলে। আবার কোনো কোনো প্রদেশে তুলার চাষের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কোন্ প্রদেশে তুলার চাষ কিরূপ ভাবে চলিতেছে নীচের তালিকায় তাহারই পরিচয় খতাইয়া দেওয়া গেল।

চতুর্দ্দশ তালিকা

১৯২১-২২ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশের তুলার ফসলের তুলনা-মূলক বিবরণ

০০০ পরিত্যক্ত হইয়াছে

প্রদেশ	আবাদী তুলার জমীর পরিমাণ (একর)	ফসলের পরিমাণ (৪০০ পাউণ্ড বেল হিসাবে)	ভারতবর্ষের মোট তুলার জমীর সহিত প্রতি প্রদেশের তুলার জমীর শতকরা হিসাব	প্রতি প্রদেশের মোট আবাদ জমীর সহিত তুলার জমীর শতকরা হিসাব
বোম্বাই (সিন্ধু সহিত)	৫২৭৬	১২২২	২৮·৪	১৪·৩
মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্য	৫৪৮৩	১৩৩১	২৯·৭	৩১·৪
হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজ	৪৭১৭	১২১১	২৫·৫	১৬·৮
পাঞ্জাব	১২৩৯	২৯৬	৬·৭	১১·৬
সংযুক্ত প্রদেশ	৮২৮	২৪৪	৪·৫	৭·৬
বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম	১৮৪	৪৩	০·২৫	০·৪
ভারতের অন্যান্য স্থান	৭২৪	১৩৮	০·৭৫	...
মোট	১৮৫৫১	৪৪৮৫	...	...

১৪ নম্বরের তালিকায় দেখা যায় যে, মধ্য-প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। মধ্য-প্রদেশে তুলা জন্মায় ১৩ লক্ষ বেল এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ (ইহাদের ভিতর হায়দ্রাবাদও আছে) এই উভয় স্থানেই ১২ লক্ষ বেল হিসাবে তুলা উৎপন্ন হয়। সর্ব্ব-সমেত এই তিন স্থানে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ ৩৭ লক্ষ বেল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ষোল আনা তুলার ভিতর ১৩½ আনা তুলাই উৎপন্ন হয় উক্ত তিন স্থানে। বাকী আড়াই আনা তুলা জন্মে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে। সুতরাং তুলার সম্পর্কে মধ্য-প্রদেশ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এই তিনটি স্থানেরই গুরুত্ব বেশী। ভারতবাসী বলিতে যেমন ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন যাহারা গ্রামে বাস করে তাহাদিগকেই বুঝায়, যে দশ জন সহরে বাস করে তাহাদিগকে বুঝায় না, ভারতবর্ষের তুলা বলিতে ভারতবর্ষের শতকরা ৮৫ ভাগ তুলাকেই বুঝায়, যে পাঁচ ভাগ তুলা পাঞ্জাবে জন্মায় তাহাকে বুঝায় না। এইখানে মনে রাখা দরকার যে গবর্মেণ্টের তদ্বিরে অজস্র খাল কাটিয়া জল-নিকেষের ব্যবস্থা করার ফলে পাঞ্জাবে লম্বা আঁশের তুলা জন্মিতেছে।

ভারতবর্ষের কৃষক ও তুলার চাষ

ভারতবর্ষের তুলার সমস্যা সমাধানের উপর ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ বিশেষ ভাবেই নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তাহাদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়াই করা চলিবে না—এ সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কৃষকদের দিকেও তাকাইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না ভারতবর্ষের তুলা আমেরিকান তুলার সমশ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলার জহুরীদের চোখে

ভারতবর্ষের তুলার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। আর সেই জন্তই ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইবার চেষ্টা গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ এরূপ ভাবে চলিতেছে। ডাঃ জে, টড লিখিয়াছেন :—
"ভারতবর্ষের অধিকাংশ তুলার আঁশ এত ছোট যে দুনিয়ার তুলার বাজারের হিসাব-নিকাশে তাহার স্থান নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে সমস্যাটা আরো জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় তুলার যে ফসল ফলিয়াছে তাহার বেশীর ভাগ তুলাই ছোট এবং দুর্ব্বল আঁশের। আরো বিপদ হইয়াছে এই যে, গত মরশুমের শেষ ভাগে যে অপরিমিত তুলা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে তাহার বেশীর ভাগই এই দুর্ব্বল আঁশের। সুতরাং ভারতবর্ষ দুনিয়ার বাজারে যে তুলা সরবরাহ করিতে পারে তাহার আঁশও দুর্ব্বল ও ছোট বলিয়া দুনিয়ার বাজারে তাহার চাহিদা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মুহূর্ত্তে দুনিয়ার বাজারে যে তুলার প্রয়োজন তাহা ১⅛ ইঞ্চি অথবা তাহার অপেক্ষাও বড় আঁশের হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে এ তুলা একেবারেই জন্মায় না।"

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতীয় তুলার কোনোই স্থান নাই এবং সামান্য একটু আধটু উন্নতির দ্বারা স্থান করিয়া লওয়াও সম্ভবপর নহে। সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহাকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে হইলে ইহার ঢের উন্নতি করা দরকার। তুলার সম্পর্কে ভারত-সরকারের নীতি বর্ত্তমানে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। পরিণামে তাঁহাদের এই নীতি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে আজ সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যৎ বাণীই করা চলে না। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটির সেক্রেটারী মিঃ বার্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইতে হইবে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক গুলি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, যথা—ভারতবর্ষে এমন কোনো অঞ্চল আছে কি না যেখানে এই তুলা জন্মাইলে তাহাতে লাভ হইতে পারে ;—উন্নতি কতটা পরিমাণে করা আবশ্যক ; যে তুলা আছে তাহারই আঁশের খানিকটা উন্নতি করিলে তাহাই স্থায়ী ভাবে লাভজনক হইবে, না পুরানো জিনিষটাকে একেবারে লোপ করিয়া দিয়া উৎকৃষ্টতর নূতন ধরণের তুলা জন্মানোর দিকে চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ; প্রতি একরে তুলার ফলন ও কাপাস হইতে প্রাপ্ত তুলার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা কেন্দ্রের আগাগোড়াই ছোট আঁশের তুলার চাষের জন্ম ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে কি না ; লম্বা আঁশের তুলার জন্ম যে দাম পাওয়া যাইবে তাহাতে, ফলন ও কাপাস হইতে প্রাপ্ত তুলার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ক্ষতি পোষাইবার সম্ভাবনা কতখানি আছে, নূতন তুলার জন্ম লাভজনক বাজার গড়িয়া তোলা কতটা সম্ভব হইবে ?—এই সব প্রশ্ন এবং এই ধরণের আরো বহু প্রশ্ন তুলার সমস্যাটাকে অতিমাত্রায় জটিল করিয়া রাখিয়াছে এবং যে সব কর্মচারীর ঘাড়ে তুলার নীতি-নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার পড়িয়াছে তাঁহাদের সকলকেই এই সব প্রশ্ন বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

এই সম্পর্কে গবর্মেণ্ট এখনও কোনো বিশেষ নীতি অবলম্বন করেন নাই। সম্ভবতঃ বোম্বাইএর তুলার মিলওয়ালাদের প্রতিপত্তির জোরে কমিটি তাঁহাদের স্বার্থকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় মিলের স্বার্থের দিকেও তাঁহাদিগকে কতকটা নজর রাখিতে হইবে। সাম্রাজ্যের দিক হইতে এবং মিলের মালিকদের দিক হইতে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা হইলেও ভারতীয় কৃষকদের দিক হইতে এ সমস্যা সমাধানের হয় তো কোনো চেষ্টাই হইবে

না। কারণ তাহারা শক্তিহীন, কমিটিকে চোখ রাঙাইতে পারে এমন শক্তি তাহাদের নাই। ল্যাঙ্কাশায়ার চাহিতেছে, ভারতবর্ষ লম্বা আঁশের তুলার চাষের ক্ষেত্রে পরিণত হউক, মিল চাহিতেছে, ভারতবর্ষে তুলার চাষের ক্ষেত্র বাড়িয়া উঠুক, যেন সে সব ক্ষেত্রে ২০ হইতে ৩০ কাউণ্টের সূতা প্রস্তুতের উপযুক্ত তুলা তৈরী হইতে পারে। ইহাদের কথা লইয়াই গবর্মেণ্ট মাথা ঘামাইতেছেন। কৃষকদের কথা কেহই ভাবিতেছেন না। তাহাদের স্বার্থ কিন্তু লম্বা আঁশের তুলার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। কারণ ছোট আঁশের তুলা দিয়া মিলে উচ্চতর কাউণ্টের সূতা কাটা না চলিলেও চরকায় তাহা চলে। মিলে যে সব পদ্ধতির ভিতর দিয়া তুলাকে সূতা কাটার উপযোগী করিয়া তোলা হয় তাহাতে তাহার আঁশ নষ্ট হইয়া যায়। চরকার পদ্ধতিতে আঁশের এ বিপদ নাই। সুতরাং একই আঁশের তুলাতে চরকায় মিলের অপেক্ষা ঢের বেশী কাউণ্টের সূতা তৈরী হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মিলের টাকুর যে তুলায় ১০ কাউণ্টের সূতা কাটে, চরকায় সে তুলায় অনায়াসে ২০ কাউণ্টের সূতা কাটা যায়। সুতরাং যে তুলায় মিলে ১০ কাউণ্টের সূতা তৈরী হয়, ভারতবর্ষের জন্য সেই তুলাই যদি বাছিয়া লওয়া হয় তবে পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য তাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। মিলে যে তুলায় ১০ কাউণ্টের সূতা তৈরী হয় না সে ধরণের তুলা ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মায়। এই সব দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, তুলার আকারেই হোক্ অথবা মিলের বস্ত্ররূপেই হোক্, কেবলমাত্র বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্যই এদেশে লম্বা আঁশের তুলার চাষ করা প্রয়োজন। তুলার চাষ সম্বন্ধে যাঁহারা পরীক্ষা করিতেছেন তাঁহারা কেবলমাত্র মিলের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখিয়াই চলিয়াছেন, পারিবারিক প্রয়োজনটার দিকে তাঁহাদের

কোনোই খেয়াল নাই। তুলার চাষের জন্য যদি কোনো পরীক্ষা সত্য সত্যই করিতে হয়, তবে কেবল মিলের স্বার্থ নহে, পারিবারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির পথটাও যাহাতে বজায় থাকে সে সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া কখনো সঙ্গত হইবে না। ভারতবর্ষে গৃহ-শিল্পের জন্য চরকায় যে ভাবে সূতা কাটা হয় তাহার পদ্ধতিটা খুব উন্নত নহে। অথচ জাতীয় উন্নতির জন্যই তাহার সংস্কার করা দরকার। তুলার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নীতি অবলম্বন করিবার সময় এ কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কারণ চরকায় সূতা কাটা যেমন কৃষকদের পক্ষেও লাভজনক তেমনি যাহারা পারিবারিক ব্যবহারের জন্য তুলা কিনিয়া সূতা কাটে তাহাদের পক্ষেও কম লাভের বস্তু নহে। তুলা পরিষ্কারের পদ্ধতির সংস্কার করাও দরকার, তাহাকে বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনার ব্যবস্থারও উন্নতি করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কোনোরূপ মত-দ্বৈধ নাই। কিন্তু আঁশের উন্নতির সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন উঠে, তাহার মীমাংসা অত সহজে করা যায় না। তাহার মীমাংসা কৃষকদের কিসে লাভ হইবে তাহারই উপর নির্ভর করে।

তুলার আঁশের দীর্ঘত্ব এবং কাপাস হইতে প্রাপ্ত তুলার পরিমাণ লইয়া যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যায় যে, 'গোসিপাম নেগলেকটাম' জাতীয় তুলাই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আরো একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, এই 'গোসিপাম নেগলেক্টাম' জাতীয় তুলার ভিতর রোজিয়াম জাতীয় তুলার আঁশ $\frac{8}{8}$—$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি অথচ কাপাস হইতে ইহারই প্রাপ্ত তুলার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য অবস্থার ভিতর কোনোরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা না দিলে যে কাপাস হইতে তুলা বেশী পাওয়া যায় কৃষকদের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক।

পঞ্চদশ তালিকা

ভারতে উৎপন্ন তুলার শ্রেণী-বিভাগ ও মোট ফসলের সহিত প্রত্যেকের ফলনের শতকরা অনুপাত

বর্ণনা	আঁশের দৈর্ঘ্য	কার্পাস হইতে প্রাপ্ত তুলার শতকরা হিসাব	মোট ফসলের সহিত উৎপন্ন তুলার শতকরা হিসাব—১৯২১-২২	
উমরাস্				
১। খান্দেশ	৪/৮–৬/৮	৩২	৭·০	১। বিভিন্ন জাতীয় বেরার তুলার সংমিশ্রণ; ইহার ভিতর গসিপাম ইণ্ডিকাম নাই।
২। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া	৫/৮–৬/৮	৩৩	৪·৫	২। বিভিন্ন জাতীয় বেরার তুলার সংমিশ্রন
৩। বরসী ও নাগর (বাণী) ৪। হায়দ্রাবাদ গাওরাণী	১"–১ ১/৮	২৫	১৮·০	৩। গসিপাম ইণ্ডিকাম
৫। বেরার প্রভৃতি ৬। মধ্য প্রদেশের মিশ্র-কাপাস (জারী)	৬/৮–৭/৮	৩৫	২৫·২	৫ এবং ৬। গসিপাম নেগ্লেকৃটাম জাতীয় বিভিন্ন তুলার সংমিশ্রণ—যথা—
মোট			৫৪·৭	
বেঙ্গল সিন্দ				
৭। সংযুক্ত-প্রদেশ ৮। রাজপুতনা	৪/৮–৫/৮	৩৬	৭·৪	
৯। সিন্ধু-পাঞ্জাব	৪/৮–৫/৮	৩৫	৬·১	
অন্যান্য রকমের			০·৪	
মোট			১৩·৯	
আমেরিকান				
১০। পাঞ্জাব	৭/৮	৩৩		জি, হিরসুটাম
১১। ধোল্লেরা	৫/৮–৬/৮	৩৩	১০·২	জি, হারবেসিয়াম
১২। ব্রোচ	৫/৮–৬/৮	৩২	৩·৮	... ...
১৩। কুম্‌প্তা ধারওয়ার	৭/৮	২৬	৪·৭	... ...
১৪। ওয়েষ্টার্ণ ও নদার্ণ	৬/৮–৭/৮	৩০	৩·২	জি, হারবেসিয়াম ও জি, ইণ্ডিকামের সংমিশ্রন
১৫। কোকনদ	৫/৮–৭/৮	২৩	০·৯	জি, ইণ্ডিকাম (সংমিশ্রন)
১৬। টিন্নেভেলি ১৭। সালেম ১৮। কাম্বোডিয়া	৬/৮–৭/৮ ৭/৮–১" ৫/৮–৬/৮	২৭ ২৫ ৩৩	৫·৩	জি, হারবেসিয়াম ও জি, ইণ্ডিকামের সংমিশ্রন জি, হিরসুটাম
১৯। কুমিল্লা, ব্রহ্ম ও অন্যান্য রকমের	৩/৮–৪/৮	৪৩	১·৬	
সর্ব্ব-সাকুল্যে			১০০	

শ্রেণী	আঁশ	কাপাস হইতে প্রাপ্ত তুলার শতকরা হিসাব
জি, এন, ম্যালভেন্সি	৬/৮–৭/৮	২৫
জি, এন, ভেরাম	৫/৮–৬/৮	৩০
জি, এন, রোজিয়াম	৩/৮–৫/৮	৪০
জি, এন, কাটচিকাম	৪/৮–৫/৮	৩৮
জি, ইণ্ডিকাম	১"–১ ১/৮	২৫
জি, হিরসুটাম	৬/৮–৭/৮	৩১

তুলার শ্রেণী-নির্ব্বাচন

জমী এবং কৃষকদের পক্ষে কোন জাতীয় তুলা বিশেষ ভাবে উপযোগী তাহার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ পরীক্ষার ভার গবর্ণমেন্টকেই গ্রহণ করিতে হয়। কৃষি বিভাগের নানা জমীতে পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সহজেই স্থির করিতে পারেন, কোন্ জমীর পক্ষে কোন্ বীজ উপযোগী। ভারতীয় কটন কমিটির অধিবেশন ও পর্য্যটন সুরু হইবার পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। এই সব পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা বহু তথ্য-পরিপূর্ণ।

কোনো জমীতে খাঁটি এক জাতীয় তুলা উৎপন্ন করা কঠিন। কোনো কৃষক যদি তাহার জমীর পক্ষে উপযোগী মনে করিয়া কোনো এক বিশেষ জাতীয় তুলা উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে গাছের ফুলের উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ কেবলমাত্র ফুলের দ্বারাই তুলার জাতি নির্ণয় করা সম্ভব। জাতি নির্ণয় ঠিক হইয়া গেলে কেবলমাত্র সেই জাতীয় চারাকেই ক্ষেতে রাখিয়া আর সমস্ত চারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তবেই খাঁটি এক জাতির তুলা উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু বিভ্রাট উপস্থিত হয় আবার বীজ ছাড়াইবার সময়। বর্ত্তমানে বীজ ছাড়াইবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহাতে সমস্ত কার্পাস এক সঙ্গে বীজ-ছাড়ানোর গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানে বীজ হইতে তুলা বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে। এই বীজ-ছাড়ানোর ঘর সমস্ত জাতীয় কার্পাসের বীজের মিলনের

শ্রীক্ষেত্র বিশেষ। সুতরাং একবার যে কার্পাস এই শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহার জাতি খাঁটি রাখিয়া বাহির হইয়া আসা কঠিন। গবর্মেণ্টের পরীক্ষাগারগুলিতে অবশ্য এ বিপদ নাই। এ বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক হইয়াই তাঁহারা কাজ করেন। তুলার চাষ-আবাদের কেন্দ্রগুলির সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বীজের গোলাঘরও আছে। সুতরাং খাঁটি বীজ সেখান হইতে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু বীজ কোনো রকমে খাঁটি সংগ্রহ করা গেলেও তাহাকে খাঁটি রাখার পথে অসংখ্য বাধা আছে। গবর্মেণ্টের পরীক্ষা প্রায় এক শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই একশত বৎসরের ভিতর পরীক্ষার্থে আনীত বৈদেশিক বীজ এ দেশের সাধারণ বীজের সহিত মিশিয়া দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের তুলার ক্ষেতগুলি এই মিশ্র বীজের চাষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত।

যাঁহারা পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা একটি বিশেষ শ্রেণীর বীজ লইয়া এক খণ্ড স্বতন্ত্র জমীতে বপন করেন। তাহার পর শস্য উৎপন্ন হইলে বীজ ছাড়ানোও হয় পৃথক স্থানে। গবর্মেণ্টের এই সব পরীক্ষাগারে এইরূপে বীজ বাছাই-এর কাজ চলে। একান্ত ধৈর্য্য এবং নিপুণতার সহিত সে সব স্থানে দোআঁশলা তুলা উৎপন্ন করার কাজও চলিতেছে। এই সব পদ্ধতির দ্বারা খুব চমৎকার ফলও পাওয়া গিয়াছে।

১৫ নম্বর তালিকার দিকে তাকাইলে জি এন রোজিয়াম জাতীয় তুলার প্রতি অতি সহজেই নজর পড়ে। কারণ ইহার আঁশ চলনসই তো বটেই, (½—⅝ ইঞ্চি) তাহাছাড়া ইহার কার্পাস হইতে যে তুলা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও খুব বেশী। গবর্মেণ্টের পরীক্ষায় এই জাতীয় তুলার খুঁটিনাটি সমস্তই ধরা পড়িয়াছে এবং বিস্তার লাভেরও সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় কটন কমিটি এই শ্রেণীটিকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেছেন না। কৃষি-বিভাগের যে সব কর্ম্মচারী নানা প্রদেশে পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের ভিতর ডাঃ পার ছিলেন একজন। ডাঃ পার নিযুক্ত ছিলেন বাছাই এবং শ্রেণী-বিভাগ করার কাজে। দুই শ্রেণীর তুলা প্রথমে বাছাই করিয়া লওয়া হয়। তাহার ভিতর হইতে ডাঃ পার পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, যে শ্রেণীর ফুল হরিদ্রা বর্ণের, তাহার আঁশ বড় হয়। কিন্তু ফলন এবং টেকসই হিসাবে জি এন রোজিয়ম (Aligarh White Cotton) এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং লাভজনক। এই জাতীয় কার্পাস হইতে যে তুলা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ শতকরা ৩৮-৩৯ ভাগ। কিন্তু মিশ্র জাতিটির ভিতর হইতে শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী তুলা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া উহার ফলনও বেশী এবং রংও শুভ্রতর, অন্ততঃ সেই সব বৎসরে যে সব বৎসরে জল কম হয়। ডাঃ পার এই সাদা ফুল-ওয়ালা তুলার জাতিটি পরীক্ষার দ্বারা কৃষকদের বিশেষ উপযোগী দেখিয়াই তাহার বিস্তারের দিকে ঝোঁক দেন। এই জাতিটি অন্যান্য নানা তুলার সহিত মিশ্রিত হইয়াই আবাদ হইতেছিল। ডাঃ পারই ইহাকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন এবং কৃষকদের ভিতর ইহার বিস্তারের কৃতিত্বও তাঁহারই। এই তুলার চাষের দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল, ডাঃ পার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার পরিমাণ প্রতি একরে শতকরা ১৫ টাকা। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১,২০,০০০ একর জমীতে এই জাতীয় তুলার চাষ করা হইয়াছিল। ফলে এই অঞ্চলের কৃষকেরা ১৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ করে। এই লাভের জন্য দরিদ্র কৃষকদের সমস্ত কৃতজ্ঞতাই যে ডাঃ পারের প্রাপ্য তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কৃষকদের উপকার

হইলেও ডাঃ পারের কাজ সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। কারণ যে তুলা কৃষকদিগকে এতগুলা টাকা পাওয়াইয়া দিয়াছে তাহার আঁশ ছোট। সুতরাং তাঁহার কাজ কটন-কমিটির অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপে এ তুলার কিঞ্চিৎ আদর হইলেও কানপুর কটন ইণ্ডাষ্ট্রীর কর্ত্তারা এই তুলাকে নামঞ্জুর করিয়াছেন, আর সেই অছিলাতেই কটন কমিটিও ইহাকে নামঞ্জুর করিয়া লিখিয়াছেন—"যে পর্য্যন্ত না নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষকদের পক্ষেও সমান লাভজনক নেগ্‌লেক্‌টাম জাতীয় তুলার উৎকৃষ্টতর কোনো শ্রেণী এদেশে জন্মাইতে পারে না, সে পর্য্যন্ত কোনো বিশেষ জাতীয় তুলার প্রসারের জন্য চেষ্টা করা আমরা ভুল নীতির অনুসরণ করিয়া চলা বলিয়াই মনে করি।" এই কমিটির নায়কেরা যে মনস্তত্বের লোক তাহাতে তাঁহাদের কোনো প্রমাণ দেখাইয়াই খুসী করা কখনো সম্ভব হইবে না, সে প্রমাণ যতই জোরালো হোক্ না কেন; এবং ভারতবর্ষের উপযোগী যে ফসলই যত পরীক্ষার পরই গ্রহণ করা হোক্ না কেন, তাহা যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রয়োজন মাফিক লম্বা আঁশের তুলা না হয় তবে তাহা তাঁহারা নামঞ্জুর করিবেনই। কারণ তাঁহাদের কষ্টিপাথর, এ দেশের নিঃস্ব, দরিদ্র কৃষকের কল্যাণ নহে, তাঁহাদের কষ্টিপাথর ল্যাঙ্কাশায়ারের কলের মালিকদের স্বার্থ।

যুক্ত প্রদেশের এই "White-flowered Aligarh" জাতীয় তুলার অনুরূপ অবস্থা মধ্যপ্রদেশের রোজিয়াম-জাতীয় তুলার অদৃষ্টেও ঘটিয়াছে। সেখানে যে সব বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের সাক্ষ্য লইয়া আলোচনা করিলেই কমিটির আসল উদ্দেশ্য যে কি তাহা ধরা পড়ে এবং কৃষকদের প্রকৃত স্বার্থ যে কোথায় তাহাও বোঝা যায়। আমি এখানে কেবলমাত্র দুই জনের সাক্ষ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মধ্যপ্রদেশের কৃষি বিভাগের অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর মিঃ ডি ক্লুষ্টন এম-এ, বি, এস্-সির সাক্ষ্য—নবেম্বর, ১৯১৭

মিঃ ক্লুষ্টন ১২ বৎসর মধ্যপ্রদেশে তুলার চাষ-আবাদের ভিতর কাটাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা তুলার চাষীদের সম্পর্কে আসিতে হইয়াছে। এদেশে লম্বা আঁশের তুলার প্রবর্ত্তনের জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বেরারের 'কটন কমিশনার' রিভেট কারণ্যাক যে চেষ্টা সুরু করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে যে সব পুঁথি-পত্র ছিল তাহার সমস্তই মিঃ ক্লুষ্টন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই বিভাগ এদেশে আমেরিকান এবং ইজিপ্সিয়ান জাতীয় তুলা জন্মাইতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে যে তুলা জন্মে তাহার আঁশ দুর্ব্বল হয়। সুতরাং তাহা লাভজনক হইতে পারে নাই। এ দেশের কৃষকদের বীজ বাছাই সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই ছিল না। গবর্মেণ্ট নানা স্থানে সময়ে সময়ে কৃষকদের ভিতর শ্রেণী বিশেষের বাছাই-করা বীজ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে দেশী ও আমেরিকান এই উভয়ের মিশ্রণে এক রকম মিশ্র ফসলের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান জারী তুলার ভিতর শতকরা ২০ ভাগ আমেরিকান তুলা আছে। মিঃ ক্লুষ্টনও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিয়া প্রথমে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাণী জাতীয় তুলাই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা আঁশের তুলা। এই জাতীয় বীজ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নানা স্থানে ফলাই-বার চেষ্টা চলিয়াছিল। তাহার পর আবার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের

পরীক্ষাগারগুলিতে বাণী এবং অন্যান্য বিদেশী বীজ লইয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা চলে।

"এই সমস্ত পরীক্ষা ১৯০৫ সালে আবার আরম্ভ হয়। সেই সময় নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি (মিঃ ক্লষ্টন) ল্যাঙ্কাশায়ারের আবেদনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ভারত-গবমের্ণ্টের কৃষি-বিভাগের প্রথম বিশেষজ্ঞরূপে মধ্য প্রদেশে আসিয়া হাজির হন। ল্যাঙ্কাশায়ারের অনুরোধে আবার ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্নের চেষ্টা সেই সময় সুরু হয়। British Cotton Growing Association সাম্রাজ্যের ভিতর তুলার সেই উন্নতি-প্রচেষ্টার ব্যয় বহনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"১৯০৪—০৫ সালে বাণী জাতীয় বীজ মধ্য প্রদেশের তুলার চাষীদের ভিতর বিতরণের জন্য কৃষি-বিভাগ প্রচুর বীজ ক্রয় করিলেন। যে সব কৃষক এই বাণী বীজের দ্বারা তুলা উৎপন্ন করিবে তাহাদিগকে একটা 'প্রিমিয়াম' দিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। কিন্তু তখন বাণী বীজের নামই কৃষকদের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা খুব অল্প কৃষকই পাইলেন যাহারা তাহাদের ক্ষেতে সেই বীজ বপন করিতে স্বীকৃত হইল।"

ভারতীয় কৃষকদের সেবায় ১২ বৎসর

দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাতেই মিঃ ক্লষ্টন বুঝিতে পারিলেন, যে, মধ্য-প্রদেশের তুলার উন্নতির সত্যকার পথ কোন্‌টি। ইহার পরের ১০ বৎসর তাঁহার চেষ্টা কিসে ভারতবর্ষ এবং তাহার কৃষক সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ঘুচিবে তাহারই পথ নির্ণয়ে কাটিয়াছে। শত শত সাক্ষ্যের ভিতর

হইতেও এই একটি লোকের সাক্ষ্য পড়িলে মনটা খুসী হইয়া উঠে। এই লোকটি কৃষকদের প্রকৃত গন্তব্য পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবং বিদেশী হইয়াও ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের খাতিরে এদেশের স্বার্থকে বলিদান করেন নাই। আর সেই জন্যই সমস্ত মধ্যপ্রদেশ যাহাতে আর সব বীজ বাদ দিয়া তাহার আবহাওয়ার উপযোগী ফসলই ক্ষেতে ফলায় তাহারই চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে বীজটার উপর জোর দিয়াছিলেন, দাম ও লাভের হিসাবে আর কোনো জাতীয় বীজের সহিত তাহার তুলনাই হয় না।

(৫৩৬) "আমি যখন এই প্রদেশে তুলার চাষের ভার লইয়া আসি তখন এ প্রদেশে লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদনের চেষ্টা যথেষ্ট হইলেও কৃষকদের লাভ এবং ক্ষতির প্রশ্নটা লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিবার প্রকৃত চেষ্টা কিছুমাত্র হয় নাই। প্রথম যে কাজে আমি হাত দিই তাহা ছিল, এ দেশে যে তুলা জন্মায় তাহার শ্রেণী বিভাগ করা, তাহার উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক করা, এবং তাহার কার্পাস হইতে শতকরা কত ভাগ তুলা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা। রায়তদের পক্ষে যে জাতীয় তুলা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক তাহা ঠিক করিয়া তাহার পরেই আমি নজর দিলাম সেই তুলা যাহাতে সাধারণের অথবা সমবায় সমিতির ক্ষেতে বোনা হয় তাহার দিকে। বোম্বাই প্রদেশ এবং যুক্ত প্রদেশের কোনো কোনো অংশে রোজিয়াম জাতীয় বীজ বপনের এইরূপ চেষ্টা বর্ত্তমানে চলিতেছে। এই দুইটি প্রদেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার মোট পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ বেল। ছোট আঁশের যে তুলা এ সব স্থানে জন্মায় তাহার কলন চাহিদা অপেক্ষা কখনো বেশী হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। জাপানে অতি দ্রুত গতিতে টাকুরের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং ভারতবর্ষের তুলার রপ্তানী প্রতি বৎসরই সেখানে

বাড়াইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া চীনেও ভারতবর্ষের তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার চিহ্নই সুপরিস্ফুট।

(৫০৭) "কৃষি-বিভাগ ভারতবর্ষে সমস্ত রকমের বড় এবং মাঝারি আঁশের তুলা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমেরিকান, ইজিপ্সিয়ান তুলা কিছুই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু ইহাদের কোনোটাই প্রতি একরের ফলনের অনুপাতে দামের দিক দিয়া রোজিয়াম জাতীয় তুলার কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই। কৃষি বিভাগের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া কাজ করা। সেইজন্য আমরা রোজিয়াম জাতীয় তুলার চাষের প্রসারের জন্যই চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা যথেষ্টরূপে সফলও হইয়াছে। আমরা বৎসরে সমবায় সমিতির বীজের আড়ৎ হইতে কৃষকদের বপনের জন্য ১ নম্বরের রোজিয়াম বীজ প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড সরবরাহ করিয়া থাকি।"

(৫৩১) "আকোলা ছাড়া আর কোনো জেলায় আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ লইয়া পরীক্ষা না করিলেও বীজের আড়তের মালিকেরা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রোজিয়াম জাতীয় তুলার চাষই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং তাহাতে লাভও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আকোলা পরীক্ষাগারে যে ফল পাওয়া গিয়াছে এই ফলের সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে মেলে।"

(৫১২) "যখন বাণী (হিঙ্গনঘাট) তুলা উৎপন্ন হইল ক্রেতারা কাতি-বিলায়েত অথবা জারী প্রভৃতি ছোট আঁশের তুলা হইতেও তাহার দাম দিয়াছিল ঢের কম। কারণ বাণী কার্পাস হইতে যে তুলা পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল খুব অল্প। এই সূক্ষ্ম জাতের তুলা যাহারা উৎপন্ন করিয়াছিল তাহাদের দুই দিক দিয়া লোকসানের ধাক্কা সহ্য

করিতে হইয়াছে। তাহাদের কাপাস গড়-পড়তায় ফলিয়াছে অপেক্ষাকৃত কম, তাহা ছাড়া প্রতি "খান্দিতে" তাহা বিকাইয়াছেও অপেক্ষাকৃত অল্প দামে। বূড়ী তুলার চাষ এক সময়ে গবর্মেণ্টের বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াছিল, চাষের জমীও প্রায় ৪ হাজার একারে উঠিয়াছিল। কৃষি-বিভাগ এই তুলা এম্প্রেস মিলের ম্যানেজারের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ম্যানেজার তাহার জন্য চড়া দামও দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এ দেশের ফসল ফলাই-বার সময়টা এই তুলার উৎপন্নের পক্ষে ঢের অল্প হওয়ায় এবং যে বৎসর বৃষ্টিপাত কম হয় সে বৎসর ইহার পাতা ঝলসাইয়া লাল হইয়া যাওয়ায় দেশের পক্ষে এ তুলার কিছুমাত্র উপযোগিতা দেখা যায় না। ক্রেতারা সকলেই ইহাকে নিকৃষ্ট জাতীয় তুলার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিল।"

(৫০২) "রোজিয়ামের যে জাতটা বেশী ফসল দেয় সেই জাতিটা প্রবর্ত্তন করায় তাহা অন্যান্য পরীক্ষিত জাতির তুলা অপেক্ষা বেশী লাভ-জনক বুঝিতে পারিয়া চাষীরা সেই ফসলটাই জন্মাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠে। অন্য সমস্ত কম লাভের ফসলের চাষ পরিত্যাগ করিয়া বেশী স্থানে তাহারা রোজিয়াম জাতির বীজই বপন করিয়াছিল।"

(৫০৫) "কৃষি-বিভাগ বীজ বাছাই-এর যে কাজটা সুরু করিয়াছিলেন ক্রমে তাঁহার ভার গিয়া পড়ে বীজের আড়ৎগুলির উপর। এ বৎসর আমাদের ৫১৩টি রোজিয়াম জাতীয় বীজের আড়ৎ ছিল। তাহা ছাড়া ২৫টি রেজেষ্ট্রি করা এবং ২৬টি রেজেষ্ট্রি না-করা সমবায় ইউনিয়ানও ছিল। এই সমস্ত স্থান হইতে কেবলমাত্র এক জাতীয় অর্থাৎ রোজিয়াম জাতীয় বীজের চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

(৫১৮) "মধ্যপ্রদেশে কৃষকদের উপকার করাই কৃষি-বিভাগের

উদ্দেশ্য ছিল। যে সব তুলায় তাহাদের লাভের আশা নাই আমি তাহা উৎপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। তাহারা যত প্রকারের তুলা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে রোজিয়ামই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বলিয়া মনে হয়। যদি এখানে লম্বা আঁশের তুলা জন্মানো সম্ভব হইত এবং তাহা লাভজনকও হইত তবে রোজিয়ামের বদলে তাহার চাষ প্রবর্ত্তন করাইতে আমাদের কোনোও বেগ পাইতে হইত না।" "বলা বাহুল্য কৃষকদের কোনো রকমের ঝক্কি সহ্য করিবার মত অবস্থা নয়। যে সব তুলার ফলন আবহাওয়ার অবস্থা উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করে সে সব তুলা ইহারা জন্মাইতে চায় না। এই প্রদেশে পূর্ব্বে 'বুড়ী' তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। কিন্তু ১৮৮০ অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ছোট আঁশের তুলা উৎপাদনের জন্য জমীর পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ইহাদের ঝোঁক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বুড়ীর বদলে ছোট আঁশের জারী তুলার দ্বারা কৃষকদের ধন-সম্পদের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১০ বৎসরে কৃষি-বিভাগও রোজিয়াম তুলার চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। নেগলেক্টাম তুলার সাধারণ একটা সংমিশ্রণ হইতেই রোজিয়াম তুলার উৎপত্তি এবং এ তুলা সাধারণতঃ জারী নামেই পরিচিত। রোজিয়াম তুলার দিকে ঝোঁক দিয়া আমরা লম্বা আঁশের তুলার চাষ বন্ধ করি নাই। আমরা যাহা করিয়াছি তাহাতে, জারী তুলারই একটি শ্রেণী হইতে আর একটা শ্রেণীর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে মিশ্র জারী তুলা এখানকার জমীতে চাষ হইত। এখন তাহার বদলে যাহার ফলন. বেশী সেই রকমের অমিশ্র জারী তুলাই বোনা হইতেছে।"

(৫১৯) "আমরা যে রোজিয়াম তুলার উপর জোর দিয়াছি তাহার

কারণ, তাহা জারী, বাণী অথবা বুড়ী প্রভৃতি অন্যান্য লম্বা আঁশের তুলা অপেক্ষা কৃষকদিগকে ঢের বেশী লাভ দিয়াছে। লাভের উপরেই কৃষি-কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। যদি লম্বা আঁশের তুলার চাষের দ্বারা রোজিয়াম তুলা অপেক্ষা বেশী লাভ পাওয়া যাইত, তবে কৃষি-বিভাগের পক্ষে তাহার জন্য হাজার হাজার একার জমী সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না।”

(৫২৫) “যে সমস্ত জমীতে লম্বা আঁশের তুলা জন্মায় তাহাতে রোজিয়াম জাতীয় বীজের বপন বন্ধ করার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। অন্য জাতীয় তুলার ফলন অধিকতর লাভজনক হইবে একথা কৃষকেরা যতক্ষণ নিশ্চিত-রূপে বুঝিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহারা জমীতে এক বীজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রকমের বীজ কখনো বপন করিবে না। রোজিয়াম জাতীয় তুলা বর্ত্তমানে যে দামে বিকাইতেছে তাহা কৃত্রিম উপায়ে বাড়ানো হইয়াছে এ কথাও আমি বিশ্বাস করি না। লম্বা আঁশ ও ছোট আঁশ—এই উভয় ধরণের তুলাই উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করা এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক তাহারই চাষ করিবার জন্য কৃষক-দিগকে উৎসাহিত করা প্রত্যেক কৃষি-বিভাগের কর্ত্তব্য।” “আঁশ ছোট কেবল মাত্র এই অপরাধেই যদি ছোট আঁশের তুলার চাষে বাধা দেওয়া হয় তবে তাহা অন্যায় হইবে। লম্বা আঁশেরই হোক্ আর ছোট আঁশেরই হোক্, যে তুলার ফসল কৃষকদের পক্ষে লাভজনক কৃষি-বিভাগকে তাহারই উপর নজর দিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা, তাহার পর সেই অনুসারে কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর খান্দেশে এবং মধ্যপ্রদেশে জারী তুলার চাষ যাহাতে না বাড়ে তাহার

ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ, কৃষি-বিভাগ বাণী তুলা অপেক্ষা জারী তুলাকে নিকৃষ্ট ধরণের তুলা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে তুলার চাষ কৃষকদের পক্ষে লাভজনক নহে সেই তুলার চাষের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা যে ভুল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং এই ভুলের কারণও খুব জোরালো নহে। লম্বা-আঁশের তুলার চাহিদা ছিল বাণিজ্যের জন্য। সুতরাং কৃষি-বিভাগ বাণিজ্যের খাতিরেই এই অন্যায়টি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

(৫৪৬) "মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে লম্বা আঁশের তুলার চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা যে সঙ্গত হইবে না সে সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ নাই।" "কোনো কোনো স্থানীয় মিল বাণী বা বুড়ী জাতীয় লম্বা আঁশের তুলাগুলিতে পূর্ব্বে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে প্রিমিয়াম দিয়াছে। এ প্রিমিয়ামও অত্যন্ত কম বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ক্রেতারা কোনো প্রিমিয়াম দেয় নাই বলিলেও চলে। গত ৬০ বৎসরের ভিতর মধ্যপ্রদেশে ছোট আঁশের তুলার আবাদ ছাড়িয়া দিয়া লম্বা আঁশের তুলার চাষ অবলম্বন করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। নিজাম রাজ্যের কতক অংশে খাঁটি বাণী তুলার চাষ হয় সত্য। কিন্তু এই চাষ হইতে এদেশে লম্বা আঁশের তুলার উপযোগিতা কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। আমার মনে হয়, নিজাম রাজ্যে যে এখনও লম্বা আঁশের তুলার চাষ চলিতেছে তাহার কারণ, সেখানকার কৃষকেরা কৃষি-পদ্ধতির দিক দিয়া এখনও ঢের পিছনে পড়িয়া আছে এবং সম্ভবতঃ তাহারা লাভজনক অন্য কোনো বীজের সন্ধান পায় নাই বলিয়াই এখনও লম্বা আঁশের তুলার বীজের চাষ বন্ধ করে নাই।"

(৫২৪) "আমার বিশ্বাস, নিজাম রাজ্যের যে সব অঞ্চলের অবস্থা

মধ্যপ্রদেশের অনুরূপ সে সব অঞ্চল হইতে বাণী তুলার চাষ কয়েক বৎসরের ভিতরই অন্তর্হিত হইবে।

অন্যান্য তুলার ফলনের অনুপাতে রোজিয়াম তুলার ফলন

(আকোলার কৃষি-শালায় নয় বৎসর ধরিয়া যে সব তুলার ফলনের পরীক্ষা চলিয়াছিল তাহাদের ফলনের গড়-পড়তা হিসাব)

শ্রেণী	কাপাস হইতে প্রাপ্ত তুলার শতকরা পরিমাণ	প্রতি একরের তুলার গড়-পড়তা ফলন	তুলার দাম—বর্ত্তমান দামের নিরিখ অনুসারে
রোজিয়াম	৪০	২১৪ পাউণ্ড	৯৩ টাকা
কাটচিকাম	৩৮	২০১ "	৮৭ "
ভেরাম	৩২	১৪৭ "	৬৪ "
মালভেন্সি	৩২	১৩৮ "	৬৬ "
বুড়ী	৩৩-৩৪	১২৮ "	৬৭ "
বাণী	২৫-২৬	১০৩ "	৫৪ "
বেরারের জারী	৩৪	১৫৮ "	৬৯ "
মধ্যপ্রদেশের সগুর জারী	৩২	১৪৭ "	৬৪ "

ক্ষেতের সাধারণ ফলন উপরোক্ত সংখ্যাগুলির ⅔ ভাগ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"যদি বর্ত্তমানের দাম অনুসারে রোজিয়াম শ্রেণীর তুলার প্রতি-পাউণ্ডের দাম ৷৷০ ধরা যায় তবে ইহার সমান লাভজনক হইতে হইলে বাণী তুলার দাম ১৵০ এবং বুড়ী তুলার দাম ৷৵১০ আনা হওয়া দরকার। কিন্তু কোনো ক্রেতাই এই দুই জাতীয় তুলার দাম প্রতি-

নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আমরা যদি একটা কিছু না করিতে পারি তবে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপুল বস্ত্র-শিল্প এবং ভারতবর্ষের যে সব মিল বেশী কাউণ্টের সূতায় কাপড় বোনে,* তাঁহাদের অবস্থা দুর্দ্দশার একেবারে চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইবে।"

মিঃ রুষ্টনের অতিরিক্ত বর্ণনা-পত্রে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের কথাটাই আছে কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের কোনোই উল্লেখ নাই। অথচ তাঁহার সাক্ষ্যে এই কৃষকদের স্বার্থের উপরে কি জোরটাই না দেওয়া হইয়াছিল! এই সব দেখিয়া মনে হয়, এই অতিরিক্ত বর্ণনা-পত্রটি কেবলমাত্র কটন কমিটির চাপেই লেখা হইয়াছিল।

লাভের নিক্তিতে রোজিয়াম জাতীয় তুলার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতীয় কটন কমিটির গৃহীত সাক্ষ্য

স্যার ফ্রাঙ্ক শ্লাই, কে, সি, এস, আই; আই, সি, এস,—১৯১৭ সালে মধ্য-প্রদেশের নাগপুর বিভাগের কমিশনার ছিলেন এবং বর্ত্তমানে মধ্য-প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ১৯০১—০৪ সাল পর্য্যন্ত মধ্য-প্রদেশের কৃষি এবং সেটল্‌মেণ্ট কমিশনার ছিলেন। কৃষি বিভাগ খোলার পূর্ব্বে ১৯০৪—০৬ সালে, তিনি ভারতীয় কৃষি-ব্যাপারের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৭—০৮ সালে তিনি

*ভারতবর্ষের মিলে যে সূতার প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ১ বা ২ ভাগমাত্র ৩২ কাউণ্টের উপরে। এই সংখ্যাও স্থায়ী নহে—প্রায় প্রতি বৎসরেই ইহার পরিবর্তন হয়।

ছিলেন মধ্যপ্রদেশের কৃষি কার্য্যের ডিরেক্টর, তাহার পর তিনি বেরারের কমিশনারের পদ লাভ করেন। ভারতবর্ষে যে সব স্থানে তুলা জন্মায় বেরার যে তাহাদের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান তাহা বলাই বাহুল্য।

মধ্যপ্রদেশে এবং বেরারে লম্বা আঁশের তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা

(২৮১) "গত ৫০ বৎসর হইতে এই অঞ্চলে যে জাতীয় তুলা জন্মায় তাহার পরিবর্ত্তে ভালো তুলা জন্মাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা কিছুমাত্র সফল হয় নাই। ১৮৬৬—১৮৭১ সালে একজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে একটি তুলার বিশেষ বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিভাগ আমেরিকান ও ইজিপ্সিয়ান জাতীয় তুলা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের হাতেই এই সব কৃষিশালার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু অসম্ভব প্রচেষ্টা বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হয়। আপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান নামক এক জাতীয় আমেরিকান তুলার গাছ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনের প্রচেষ্টার এই এক মাত্র চিহ্নই এখনও বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন জাতীয় দেশী তুলার চাষেরও চেষ্টা করা হইয়াছিল। দেশী তুলার ভিতর বাণীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ওয়ার্দ্ধা জেলাতে এবং অন্যান্য স্থানে স্বনামে ও বিভিন্ন নামে এই বাণী তুলারও চাষের চেষ্টা চলে। কৃষকেরা নিকৃষ্টতর তুলার চাষ লাভজনক মনে করায় তাঁহাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। এই সব চেষ্টার ফলে কৃষকদের মন ভালো তুলা উৎপন্ন করার দিকে তো ঘোরেই নাই বরং তাহার ফল হইয়াছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার ফলে বেশী ফলনের নিকৃষ্টতর তুলার দিকেই তাহাদের মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

বর্ত্তমানের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে যাহা রোজিয়াম এবং রোজিয়াম কাট্‌চিকাম শ্রেণীর ভিতর পড়িয়াছে কৃষকেরা তাহারই চাষ তখনকার দিনে সুরু করিয়া দিয়াছিল। এই সমস্ত প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিবরণ ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসের Agricultural Journal of India (vol. II, part II)তে প্রকাশিত হইয়াছে। তুলার চাষের পরবর্ত্তী ইতিহাসে এই বাণী তুলার আবাদও ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া তাহার স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে মিশ্র জাতীয় নিকৃষ্টতর তুলার আবাদ। এই শ্রেণীর তুলা সাধারণতঃ জারী নামেই পরিচিত। এখন কেবলমাত্র বেরারের দক্ষিণ ঘাটের পরিত্যক্ত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতেই বাণী তুলার আবাদ হয়। এখানেও জারী তুলার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভক্ত চাষীর সংখ্যা, দিনের পর দিনই কমিয়া আসিতেছে। ইহার পর নাগপুরের ফার্মে এবং অন্যত্র আমেরিকান, ইজিপ্সিয়ান এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভালো আঁশের তুলাও উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সে সব চেষ্টাও সফল হয় নাই। জল-নিষেকের ব্যবস্থার দ্বারা এক সময় মনে হইয়াছিল যে, হয় তো বা ইজিপ্সিয়ান তুলার ফসল এখানে ভালো ফলিতেও পারে। কিন্তু সে আশাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই। যে সব আমেরিকান জাতীয় তুলার ধাতে এ দেশের জল-বায়ু সহিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মধ্য প্রদেশের 'আপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান,' সাঁওতাল পরগণার 'বুড়ী', মাদ্রাজের 'কাম্বোডিয়া' প্রভৃতি—তাহাদের চাষ প্রথম প্রথম নূতন আমদানী-করা তুলার বীজের অপেক্ষা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল বটে এবং তাহাদের লইয়া যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া দেখাও হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষায় তাহারা টিকিতে পারে নাই। আমি যখন বেরারের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, তখন বুড়ী জাতীয় তুলাকে সাধারণ চাষের শস্যরূপে চালাইবার প্রচুর চেষ্টা চলিয়াছিল। এই তুলা ভারী

'জমির উপযুক্ত এবং তুলার ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত বলিয়া মনে হওয়ায় কয়েক হাজার একর জমীতে কৃষকেরা ইহার বীজ বপন করিয়াছিল। উপযুক্ত পরীক্ষার পরে এদেশে চাষের অযোগ্য বলিয়া তাহার চাষও পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, এই সব বৈদেশিক তুলার আঁশ ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের কাজ নিকৃষ্টতর মিশ্র জাতীয় জারী তুলার পরিবর্ত্তে অমিশ্র এবং খাঁটি রোজিয়াম তুলার চাষের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই পরিবর্ত্তন যে কত দ্রুতগতিতে সাধিত হইতেছে তাহার পরিচয়ও অস্পষ্ট নহে। কৃষকদের ভিতর রোজিয়াম তুলার আদর এবং তাহাদের অতিরিক্ত লাভের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

(২৮২) "ব্যর্থতার কারণ :—তুলার আঁশের উন্নতির চেষ্টা বারে বারে এদেশে কেন যে ব্যর্থ হইয়াছে আমি এখন তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করিব। (অবশ্য গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, আমার কৃষি সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞান-সম্মত অভিজ্ঞতা নাই।) প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, এ পর্য্যন্ত লম্বা আঁশের তুলার এমন কোনো জাতির সন্ধান পাওয়া যায় নাই যাহার চাষ নিকৃষ্টতর তুলার চাষ অপেক্ষা লাভ-জনক।"

(২৮৪) এই প্রদেশ সম্বন্ধে আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আছে। কৃষি-বিভাগ বর্ত্তমানে রোজিয়াম তুলার চাষের জন্য যে উৎসাহ দেখাইতেছেন তাহা আমার কাছে সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হয়। এ দেশে লম্বা আঁশের তুলার চাষের অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, যাহার ফসল অপেক্ষাকৃত আগে পাকে, পরিমাণে বেশী হয় এবং যাহার কাপাসে তুলার ভাগ বেশী থাকে এমন কোনো জাতীয় লম্বা আঁশের তুলার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত এদেশে

লম্বা আঁশের তুলার চাষে কৃষি-বিভাগ সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। গত ৫০ বৎসর হইতে এদেশে লম্বা আঁশের তুলা ফলাইবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সমস্যার মীমাংসা এতটুকুও হয় নাই।”

“পরীক্ষার দ্বারা যে ফসলটির চাষ, লম্বা আঁশের যে কোনো তুলার চাষের অপেক্ষা লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারই আবাদ বন্ধ করিয়া দেওয়া, ভারতবর্ষের কৃষকদের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইবে।”

(৩০৩) “মিঃ ক্লষ্টনের কাজের ভিতর কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই। কৃষি-বিভাগ রোজিয়ামের চাষের উপর জোর দেওয়ার পূর্ব্বেই বেরারের কৃষকেরা এই তুলার জাতিটিকে চাষের জন্য বাছাই করিয়া লইয়াছিল। মিশ্রজাতীয় রোজিয়ামের চাষও ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় ইহার প্রসারের কাজটা আগাইয়া গিয়াছে মাত্র।”

কেবলমাত্র এই দুইটি বিশিষ্ট সাক্ষীর মতামতের দিকে নজর দিলেই মধ্যপ্রদেশে রোজিয়াম জাতীয় তুলার চাষের সার্থকতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কৃষি-বিভাগের বীজ বিতরণের আড়ৎ-গুলির সাহায্যে এই বীজটির প্রসার দ্রুত গতিতেই হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে মিঃ ক্লষ্টন মনে করিয়াছিলেন যে, যে হিসাবে তিনি কাজ করিতে-ছেন তাহাতে আর ১০ বৎসরের ভিতরেই সে প্রদেশের তুলার চাষের উপযোগী সমস্ত ক্ষেত্রেই খাঁটি রোজিয়ামের বীজ ছড়াইয়া পড়িবে। রোজিয়ামের পরেই যে জাতীয় বীজটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা যায় তাহা জারী। আমরা দেখিয়াছি যে, জারী অপেক্ষা প্রতি একরে রোজিয়াম তুলাতে অন্ততঃ ১০ টাকা বেশী লাভ থাকে। এই অনুপাতে হিসাব করিলে কেবলমাত্র আকোলা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ পাওয়া

যায়। "সকলের আগে সাম্রাজ্যের স্বার্থের" দোহাইটাই যদি অত্যন্ত জোর-গলায় গাওয়া সুরু না হইত তবে মধ্য-প্রদেশে মিঃ ক্লৃষ্টন এবং যুক্ত-প্রদেশে ডাঃ পার যে বিরাট কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই আদর্শই সর্ব্বত্র অনুসৃত হইত। মধ্যপ্রদেশে এবং বেরারে প্রায় ৪৫ লক্ষ একর জমীতে তুলার চাষ হয়। এই জমীর অর্দ্ধেকেও যদি রোজিয়াম তুলার ফসল ফলানো হইত তবে বৎসরে তাহার মূল্য হইতে যে অতিরিক্ত লাভ হইত, তাহারই অঙ্কটা আসিয়া দাঁড়াইত প্রায় ২·২৫ ক্রোর মুদ্রাতে। কিন্তু কটন কমিটির মন্তব্য পড়িয়া একথা মনেও হয় না যে, তুলার চাষে মিঃ ক্লৃষ্টনের আদর্শকে অনুসরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। কমিটি মধ্য-প্রদেশের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন— "রোজিয়াম সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যদিও আমরা কৃষি-বিভাগের আদর্শকেই অনুমোদন করি, তথাপি আমাদের মনে হয় নেগ্‌লেক্টাম বা ইণ্ডিকাম্ জাতীয় শ্রেষ্ঠতর এমন একটা তুলার আবাদের দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া আবশ্যক যাহার ফলনও খুব বেশী এবং কাপাস হইতে যে তুলা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও অনেক। এই রকমের তুলার দ্বারাই রোজিয়ামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" আমি যে সব সাক্ষ্যের সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সব সাক্ষ্যের সমস্ত মতামত পাঠ করিয়াও রোজিয়াম তুলার চাষ সম্বন্ধে কটন কমিটির 'কিন্তু'টুকু কিন্তু ঘুচে নাই। এ না ঘুচার কারণ খুব সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের স্বার্থ অপেক্ষা ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থই তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই যেখানেই সুযোগ মিলিয়াছে রোজিয়াম তুলার উৎপাদন সম্পর্কে কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টাকে তাঁহারা কষাঘাত করিতে কসুর করেন নাই।

তুলার চাষের রীতিনীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, আমি

তাঁহাদিগকে নিজ নিজ প্রদেশের সম্পর্কে কটন কমিটির দ্বারা গৃহীত সাক্ষ্যের বিবরণগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই সব বিবরণে অতীত অভিজ্ঞতার সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই লিপিবদ্ধ আছে।' এই সব বিবরণের অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, দেশী ছোট আঁশের শক্ত তুলাই কৃষকদের লাভের দিক দিয়া এদেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

দামের অনিশ্চয়তা

বাণিজ্য-পণ্য হিসাবে তুলা অত্যন্ত ঝক্কিদারী ব্যবসা। তুলা বাজারে যে কি দামে বিকাইবে সে কথা পূর্ব্বে কেহই বলিতে পারে না। ফলনের সহিত ইহার কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। সমস্ত দুনিয়ার তুলার ফলনের অনুপাতেও ইহার দামের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। আমেরিকা বা ভারতবর্ষের খুব বেশী পরিমাণ স্থান লইয়া যদি অজন্মা হয় বা অতিরিক্ত ফসল জন্মে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ইহার ফলন বাজার দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নতুবা ইহার দামের পরতা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে ব্যবসাদারদের উপর। ভারতবর্ষের তুলার বাজার আমেরিকা এবং লিভারপুলের তুলার বাজারকেই অনুসরণ করিয়া চলে এবং শেষোক্ত দুই স্থানের তুলার বাজার দরও প্রায় একই রকমের। সুতরাং এই ধরণের অনিশ্চিত দামের একটি ফসলের চাষে বেশী লাভের আশায় খুব বেশী জমী নিযুক্ত করা কৃষকদের পক্ষে কখনো সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। কারণ যে কোনো মুহূর্ত্তে ইহার দামের হ্রাস হইতে পারে। ভারতবর্ষের কয়েক বৎসরের তুলার দামের হিসাব এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

বৎসর	১৯১৩-১৪	১৯১৫-১৬	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮
প্রতি মণের দর	২৮৲	২২৷৵০	২০।৵১৫	২৯৸০

বৎসর	১৯১৮-১৯	১৯১৯-২০	১৯২০-২১
প্রতিমণের দর	৪২।০	৬১	৩৮॥৵০

তুলার দামের পরিবর্ত্তন প্রায় প্রত্যহই হইতেছে। বোম্বাই-এ তুলার ক্রয়-বিক্রয় চলে এবং সেইখান হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্ত তুলার বাজারে টেলিগ্রামে তুলার দাম জানানো হয়। বোম্বাই-এর তুলার দাম খেয়ালী ব্যবসাদারদের খেয়াল, মজুত মালের পরিমাণ, তুলার আমদানী ও রপ্তানী এবং লিভারপুল ও নিউইয়র্কের দামের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক ঘটনা বা ব্যবসায়ের হাল-চালের পরিবর্ত্তনের দ্বারাও তুলার দামের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন, কোনো তুলার অঞ্চল হইতে বড় কোনো অগ্নি-কাণ্ডের সংবাদ, কোনো তুলার মিলে ধর্ম্মঘট, ফসলের ফলনের সময় আমেরিকায় অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত বা ভারতবর্ষের তুলার অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব—এই সমস্ত নানা রকমের ঘটনা তুলার দাম নিয়ন্ত্রিত করে। তাহা ছাড়া ব্যবসাদারদের খেয়াল তো আছেই। সুতরাং তুলার দামে কখন যে কোন রকমের পরিবর্ত্তন হইবে, মানুষের বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহাত নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

১৯১৮-১৯ সালের তুলার দাম ১৯১৫-১৬ সালের দামের প্রায় তিন গুণ ছিল। প্রভেদ যখন এত বেশী তখন মনে হয়, তুলার চাষের জমী বর্ত্তমানের পরিমাণকে ছাড়াইয়া উঠা কখনো সঙ্গত হইবে না। আমরা যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন করি তাহাই আমাদের প্রয়োজনের অপেক্ষা, অন্ততঃ ৪০ গুণ বেশী। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় কেবলমাত্র বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ একটি অনিশ্চিত দামের ফসলের চাষের জমী বাড়ানো অত্যন্ত বিপদ-জনক বলিয়া মনে হয়। কৃষকেরা প্রধানতঃ ঘরে চরকায় সুতা কাটিয়া

কেবলমাত্র বাদ-বাকী তুলা যদি বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করে, তবে তাহার ফল তাহাদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে কতটা যে কল্যাণের হয়, এ দেশের খাদি-কর্ম্মীদের তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা সঙ্গত। অন্যত্র আমি দেখাইয়াছি যে, জন-প্রতি বৎসরে আমাদের মোটে ১২ গজ বস্ত্রের অথবা ৫ জনের একটি পরিবারের সমস্ত লোকের বস্ত্রের জন্য দৈনিক মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটার প্রয়োজন হয়। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, গড়পড়তায় আমরা ১০ কাউণ্টের সূতা কাটি, তবে এরূপ একটি পরিবারের জন্য মাসে ৫০ তোলা অথবা বৎসরে ১৬ পাউণ্ড সূতার প্রয়োজন হইবে। প্রতি একরে গড়ে প্রায় ৯৬ পাউণ্ড তুলা জন্মায়। সুতরাং ৫ জনের একটি পরিবারের জন্য ⅙ একরের বেশী জমীতে তুলা জন্মানোর প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষের জমীতে নানা রকমের তুলা জন্মায়। এ দেশে এমন যায়গা নাই যেখানে কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী তুলা জন্মাইতে না পারে। যে সব স্থানে বাজারে বিক্রয়ের মত বেশী তুলা জন্মায় না সে সব স্থানে ৫ জনের একটি পরিবারে জন্য অন্ততঃ ⅙ একর জমীতেও যাহাতে তুলা উৎপন্ন হয় খাদি-কর্ম্মীদের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আর যে সব স্থানে তুলা অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপন্ন হয় সে সব স্থানের সব তুলাই যাহাতে বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা সঙ্গত। যে পরিমাণ তুলা আমাদের পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক তাহা মজুত না রাখিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে দেশের অদৃষ্টে দুঃখভোগ অপরিহার্য্য। এই অদূরদর্শিতার জন্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘ দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে—এই দুঃখ আর যাহাতে ভোগ না করিতে হয় দেশের সমস্ত লোকের চেষ্টা সেই দিকেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

নির্ঘণ্ট পত্র

র

ল

শ

ষ

স